আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার পঞ্চত্রিংশ গ্রন্থ

ব্রাহ্মণ-পরিবার

শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ফাল্গুন—১৩২৫

উপহার
GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar
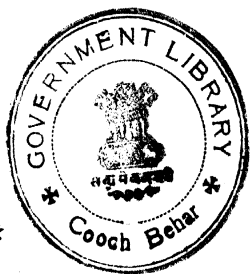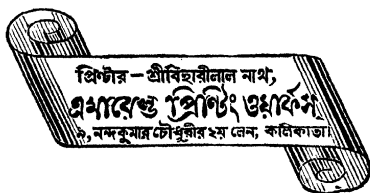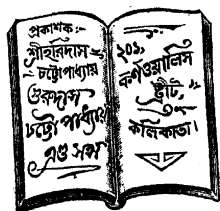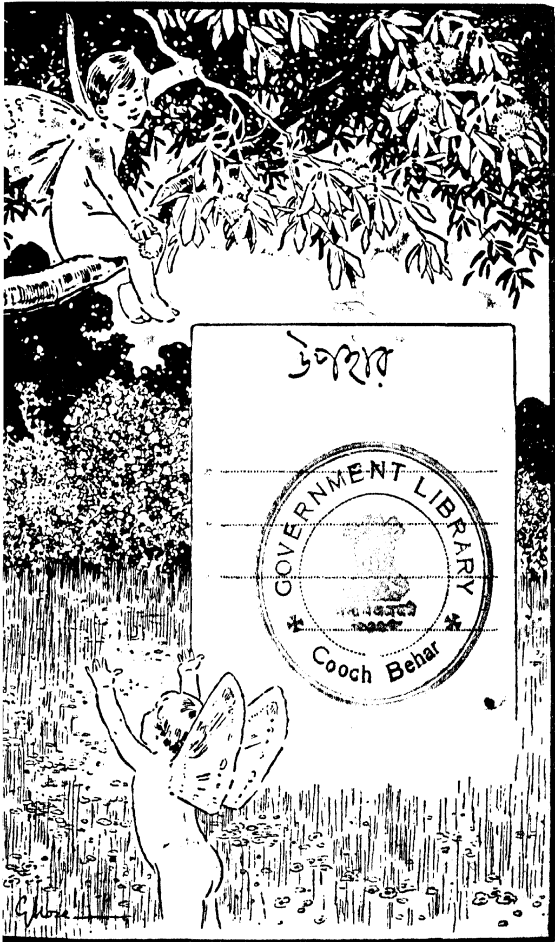
শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

উৎসর্গ

প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রতীচ্য রীতিনীতিতে অভিজ্ঞ
হইয়াও যিনি হিন্দু-গৃহস্থাশ্রমের অন্যতম প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম
সৌভ্রাত্রের পরম আদর্শস্বরূপ
সেই স্বনামধন্য
দীনজন-প্রতিপালক

শ্রীল শ্রীযুক্ত নিমাইচন্দ্র বসু

মহোদয়ের করকমলে

আমার কৃতজ্ঞতার চির-নিদর্শনস্বরূপ এই ক্ষুদ্র

'ব্রাহ্মণ-পরিবার'

ব্রাহ্মণের শুভেচ্ছার সহিত
সাদরে উৎসৃষ্ট হইল।

ইতি—

আহারবেলমা, বর্দ্ধমান,
শ্রীপঞ্চমী, ১৩২৫।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণা।

ব্রাহ্মণ-পরিবার

১
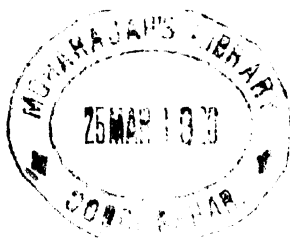
কৌলীন্য-মর্য্যাদাভারে অতিশ্রান্ত দেশপূজ্য জ্ঞানী বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম মহাশয় একদিন আমার পিতার চতুষ্পাঠী-গৃহের দ্বারে আসিয়া জানাইলেন যে, "বৎসরাবধি গৃহত্যাগ করিয়া বহু অন্বেষণের পরও আমার একমাত্র কন্যার যোগ্য পাত্র নির্ব্বাচন করিতে অক্ষম হইয়াছি। যোগ্য পাত্রের অভাবে কন্যাও অরক্ষণীয়া হইয়াছে। যোগ্য পাত্রে কন্যার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা আমার শক্তিতে আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। স্বার্থপর সমাজের সাহায্যহীন দারুণ শাসন-দৃষ্টির ভিতরে বাঁচিয়া থাকিতেও আর ইচ্ছা নাই। তাই স্থির করিয়াছি,—সঙ্কল্প করিয়াছি, যদি সূর্য্যাস্তের মধ্যে আমার শেষ চেষ্টা সফল না হয়, তবে এই অভিশপ্ত দেশ ত্যাগ করিব।" আশাহীন, আস্থাহীন কর্ম্মক্লান্ত অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের প্রত্যেক বাক্যের উপর যেন একটা দৃঢ়তা, একটা সঙ্কল্প, একটা অভিমান

ও একটা বিরাট অভিসম্পাত একসঙ্গে মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমার পিতার চতুষ্পাঠী-গৃহের ন্যায়, দর্শন, বেদান্ত শাস্ত্রাধ্যয়নশীল ছাত্রদিগকে স্তম্ভিত করিয়া, চতুঃশাস্ত্রজ্ঞানের মূর্ত্তি স্বরূপ সৌম্য শান্ত ঋষিস্বভাব আমার পিতার মর্ম্মস্থলে আঘাত করিয়া চতুষ্পাঠী-গৃহের চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার মাতৃ-বিয়োগ হইয়াছিল। সংসারে মা না থাকার জন্য ছাত্রদিগকে লইয়া বাবা বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাবার বৃদ্ধা পিসীমাতা একা বিশজন ছাত্রের, আমাদের পিতা-পুত্রের এবং ঠাকুর-সেবার ভারে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহার শক্তি যেন শীঘ্র চির-অবসর লইয়া বার্দ্ধক্যের—স্থবিরত্বের শেষ শক্তিতে পরিণত হইবে বলিয়াই একজন সাহায্যকারীর প্রার্থনায় সর্ব্বদাই পিতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। সেই জন্যই আমার মনে হইল, বাবা যদি বিবাহ করিয়া এই বিপন্ন ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করেন, তাহা হইলে সব দিক্ রক্ষা হয়। বাবার প্রিয়পাত্র ছাত্রদেরও পাঠের ক্ষতি হয় না; আমিও মাতৃহারা হইয়া আছি, আমারও সে অভাব কথঞ্চিৎ পূরণ হয়, ঠাকুর-সেবারও আর কোন ত্রুটি হয় না।

কিন্তু আমরা এখন আর কুলীন নহি। বল্লালসেনের

অনুগ্রহ-প্রদত্ত কৌলীন্যের উপর অনেকদিন পূর্ব্বে আমার পূজনীয় পিতামহ কুঠারাঘাত করিয়া, এমনই এক বিপন্ন ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এ কথা আমি তাঁহারই মুখে অতি শৈশবে শুনিয়াছিলাম। পিতামহ তাঁহার বিবাহের গল্প করিবার সময় আমাকে আরও বলিয়াছিলেন,—"বিপন্নকে রক্ষা করিতে, অতিথিকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করিতে, কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিতে কখনও নিজের দিকে চাহিয়া পরাঙ্মুখ হইও না ভাই, এই আমার উপদেশ।" যখন পিতামহের গল্পচ্ছলে এই সব উপদেশ আমার মনের উপর অধিকার বিস্তার করিত, তখন আমার বয়স সাত কি আট বৎসর, এখন আমার বয়স বিশ বৎসর। পিতার টোলে ব্যাকরণ শেষ করিয়া ভট্টি প্রভৃতি কাব্য পড়িতেছি। পিতামহ প্রদত্ত ঐ কয়টি মূল সূত্রের, মূল মন্ত্রের অর্থ যাহা নিজের ধারণায়—নিজের জ্ঞানে আমার হৃদয়ফলকে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার বুদ্ধির উন্নতি হইয়াছিল। সেই বুদ্ধির শক্তিতেই আমি আবিষ্ট হইয়া পিতার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া, তখনই বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট প্রাণের আবেগে বলিয়াছিলাম, "সার্ব্বভৌম মহাশয়, আপনি প্রকৃতিস্থ হউন, বিশ্রাম করুন, আপনাকে এই দায় হইতে আমরা মুক্ত করিব। আমি পিতার একমাত্র সন্তান,

মাতৃহারা; যদি আপনার কন্যা আমার মাতার অভাব পুরণ করিতে পারেন, আমার পিতার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় এই সব ছাত্রদের মাতৃস্থানীয়া হইয়া আমার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর ন্যায় ইঁহাদের লালন-পালন করিতে পারেন, তবে এই মুহূর্ত্তে আপনি কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন মনে করিয়া পরমানন্দে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন।" আমার এই প্রস্তাব শুনিয়া, আমার এই দৃঢ়তা দেখিয়া পিতা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; তিনি একটী কথাও বলিতে পারিলেন না। আমারও মনে হইল, আমি পিতার পিতৃদেবের স্থান অধিকার করিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে যে আদেশ প্রচার করিলাম, উপযুক্ত পুত্রের ন্যায় তিনি সেই আদেশ পালন করিতে বাধ্য। পিতাকে মৌন থাকিতে দেখিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় পরম আগ্রহভরে বলিলেন,—"আমার বহু সৌভাগ্য—আমার পিতৃপুরুষের বহু পুণ্য যে, আমার কন্যা এমন যোগ্য পুত্রের মাতা হইয়া আমার পিতৃকুলের উদ্ধার সাধন করিবে।"

২

শুভদিনে—শুভলগ্নে পিতার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল; লোকে বলিতে লাগিল আমার স্বর্গীয়া মাতা অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় আমাদের গৃহে আগমন করিয়া

সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন। মাতৃ-চরিত্রের সমালোচনা যদিও পুত্রের মুখে শোভা পায় না, তবুও আমি না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি না বলিলে যে সে মাতৃমহিমা সকলে শুনিতে পাইবে না; তাই আমি আনন্দে সে মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কন্যা অতি শৈশবে মাতৃহারা হইয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এ মর-জগতে, এ সংসারে যাহার মা নাই, তাহার অভাব কেমন করিয়া পূরণ করিতে হয়। আরও এক কথা,—মহামায়া যাঁহাদিগকে মা হইবার জন্যই এ বিশ্বে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের সে শক্তির কোনও অভাব রাখিয়া পাঠান নাই। মহামায়াই যে নারীরূপে—মাতৃরূপে সন্তান পালন করিবার জন্যই আসিয়া বিশ্বের পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন, আমার মাতা তাঁহার জ্ঞানী পিতা সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট আজীবন সে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ইহা আমি তাঁহার অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহের আবরণে থাকিয়াও বুঝিতে পারিয়াছিলাম। শাস্ত্রে দেখিয়াছি, লীলা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী সর্ব্ব-শাস্ত্র-পারদর্শিনী ছিলেন; কিন্তু আমি চক্ষে দেখিয়াছি তাঁহাদের হইতেও সর্ব্বজ্ঞা আমার মাতাকে। চতুঃশাস্ত্র-বিশারদ আমার পিতাকেও অনেক স্থলে সময় লইয়া, বুঝিয়া আমার মাতার অনেক শাস্ত্রীয় কূট বিষয়ের উত্তর দিতে হইয়াছে। পিতার

অনুপস্থিতিতে অনেক সময় আমি মাতার নিকট উপদেশ লইয়া বিদেশাগত ব্যক্তিদিগকে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়াছি। যে সব ব্যবস্থা খুব জটিল, তাহারও মীমাংসা আমার মাতা যাহা করিতেন, তাহা অভ্রান্ত হইত।

কন্যার বিবাহের পর হইতেই পাঁচ বৎসর কাল নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া যখন সার্ব্বভৌম দাদামহাশয় আমাদের গৃহে আসিলেন, তখন আমার একটি ভাই হইয়াছে। তাহার অন্নপ্রাশনের কাল উপস্থিত। কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্নপ্রাশন সময়ে সার্ব্বভৌম দাদামহাশয় তাঁহার প্রভূত সম্পত্তির একখানি দানপত্র আমার পিতার হস্তে দিয়া বলিলেন—আমার প্রথম দৌহিত্র শ্যামাদাসকে আমার সম্পত্তি দান করিয়াছি। আর দ্বিতীয় দৌহিত্র আমার অবর্ত্তমানে আমার নগদ টাকা যাহা কিছু থাকিবে, তাহাই পাইবে; এ কথাও দানপত্রে লেখা আছে। এখন আমি ৺কাশীবাস করিব। ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা।" দাদামহাশয়ের এ প্রকার দানপত্রের মর্ম্ম সকলে প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। পরে আমার মাতাঠাকুরাণী সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"আমার বড় ছেলে শ্রীমান্ শ্যামাদাস বাবাজীবনকে আমার অনুরোধে বাবা সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দিয়াছেন, আর ছোট ছেলে শ্রীমান্ উমাদাস বাবাজীবন আমার পিতার অবর্ত্তমানে, যাহা কিছু নগদ থাকিবে, তাহাই

পাইবে। এই দানপত্র আমার ইচ্ছায় হইয়াছে, আমি আমার উপযুক্ত পুত্রকে যৌতুক দিবার জন্তই এ কথা বাবাকে বলিয়াছিলাম।”

বিষয়-বুদ্ধিতে যাঁরা আমাদের দেশে তখন খুব ভাল লোক ছিলেন, তাঁরা তখন কেহই এ দানপত্রের সুখ্যাতি করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু সার্ব্বভৌম দাদামহাশয়ের যে বার্দ্ধক্য বশতঃ মস্তিষ্ক-বিকৃতি হইয়াছে, এ কথা বলিবারও সুযোগ কেহ পরিত্যাগ করেন নাই। বাবার সম্পত্তির মধ্যে পঞ্চাশ বিঘা লাখরাজ, আর পাণ্ডিত্যের মান-সম্ভ্রম ; ইহাতেই বাড়ীতে বিশ জন ছাত্র রাখিয়া, অন্ন দিয়া, বিদ্যা দান করিতেন। মায়ের শুভাগমনের পর হইতেই সংসারের উন্নতি হয়। সংসারের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে ছাত্রসংখ্যারও বৃদ্ধি হইয়াছিল। কোনও দিন কোনও অভাবের কথা তিনি কাহাকেও জানিতে দেন নাই। সার্ব্বভৌম দাদামহাশয় রাজ-পরিবারের পৌরোহিত্য করিয়া প্রায় বিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি করিয়াছিলেন। নগদ টাকাও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। চিরসংযমী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারের হঠাৎ এমন অবস্থার পরিবর্ত্তনে —বৈষয়িক উন্নতি দর্শনে সকলেই একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু বিষয়বাসনারহিত শাস্ত্রামোদী, বেদপরায়ণ, শান্ত, সৌম্য-ঋষি-স্বভাব আমার পিতা আজীবন যে ভাবে নিজের

উদ্দেশ্যকে গঠন করিয়া, বিদেশাগত ছাত্রদিগকে পুত্রাপেক্ষা যত্নে প্রতিপালন করিয়া বিদ্যা দান করিতেন, আমার মাতাও যেমন স্বহস্তে সংসারের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সকলের তুষ্টি-সাধনের ব্রত গ্রহণ করিয়াই, আমাদের গৃহে জগদ্ধাত্রীর মূর্ত্তিতে বিচরণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার কোনও ব্যতিক্রম হইল না দেখিয়া সাধারণ সকলেই যেন কেমন একটা বিশেষ আগ্রহের সহিত আমাদের কার্য্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিল। এই তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিই আমার ভবিষ্যৎ-জীবনে আশীর্ব্বাদের কার্য্য করিয়া সার্ব্বভৌম দাদামহাশয়ের ঋণজাল হইতে উদ্ধার হইবার সহায়তা করিয়াছিল।

৩

পঁচাশী বৎসরের বৃদ্ধ দাদামহাশয় ৺কাশীবাস করিবেন, তাঁহার সঙ্গে কেহই যাইবে না,—ইহা আমার মনঃপূত হইল না; তাই আমি দাদামহাশয়ের সহিত ৺কাশীধামে যাইয়া বেদান্ত পড়িবার প্রার্থনা করিয়া পিতার নিকট সে কথা জানাইলাম। সাধু ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হওয়া তখনকার রীতি ছিল না। বিদেশে যাইয়া অধ্যয়ন করা তখনকার দিনে লোকে গুরুগৃহ-গমনই মনে করিত। তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাভ্যাস দুই হইত। তাই বৃদ্ধ দাদামহাশয়ের সেবার ভার লইয়া, বেদান্ত

পড়িবার জন্ত পিতামাতার আশীর্ব্বাদে দাদামহাশয়ের হস্তেই সমর্পিত হইয়া বিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণ-প্রান্তে গিয়াছিলাম। ৺কাশী-ধামে দাদামহাশয়ের নিকট থাকিয়া আমার বেদান্ত পড়িবার ব্যাপারে লোকের মনে নানারূপ ধারণা জন্মিল। কেহ বলিল শ্যামাদাসের বিষয়-বুদ্ধি খুব তীক্ষ, তাই দাদামহাশয়ের সেবার অছিলায় নগদ টাকার উপর টাঁক করিয়া, তাহার পিতার ন্যায় জ্ঞানী পণ্ডিত লোক দেশে থাকিতেও সে ৺কাশীধামে বেদান্ত পড়িতে চলিল। ৺কাশীধাম হইতেও শ্যামাদাসের পিতার নিকট যখন ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার জন্য সন্ন্যাসীর দল আসিয়া থাকে, তখন 'দাদামহাশয়ের সেবা', 'বেদান্ত পাঠ' এ সব ওজর না দিলে কি লোকে তাহার বিমাতার অনুরোধ-প্রদত্ত দাদামহাশয়ের "রাজ-জায়গীর" কাড়িয়া লইত ?

দুই বৎসর কাল দাদামহাশয় ৺কাশীধামে বাস করিয়া স্নেহের আবরণে আমাকে আবৃত রাখিয়া বেদান্ত শিক্ষা দিলেন। মাঘী পূর্ণিমার দিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দাদামহাশয় আমাকে বলিলেন, "শ্যামাদাস, ভাই, মনে হইতেছে, আজ আমার শেষ দিন। আজই মধ্যাহ্নের সময় আমার ইহজীবনের কার্য্যাবসান হইবে। চল ভাই, একবার বাবা বিশ্বেশ্বর ও মাতা অন্নপূর্ণার দর্শন করিয়া গঙ্গাদেবীর পবিত্র তীরে অজপার শেষ করিয়া নিরঞ্জন লাভ করি।

মধ্যাহ্ন সময়ে পতিতপাবনী সুরধুনীর পবিত্র তীরে ঈশ্বর-চিন্তা করিতে-করিতে আজীবন স্বধর্ম্ম ও স্ববৃত্তি রক্ষা করিয়া বর্ণাশ্রমের গুরু, একনিষ্ঠ, স্নেহময় আমার দাদামহাশয়,—নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া পরমাত্মায় বিলীন হইয়া গেলেন।

৪

আমার পঠদ্দশা এখানেই শেষ। দানপত্রের মর্ম্মানুযায়ী আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ উমাদাস ভাই-জীবনের প্রাপ্য নগদ প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার বোঝা মাথায় করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলাম। যথাসময়ে আমার মাতাঠাকুরাণী দাদামহাশয়ের শ্রাদ্ধ সমাপন করিলেন। সাধ মিটাইয়া ব্রাহ্মণ-সজ্জন, অতিথি কাঙ্গালী ভোজন, এবং দরিদ্রের অভাব যথাসাধ্য পূরণ করা হইল। শ্রাদ্ধান্তে নগদ টাকা যাহা কিছু ছিল, সবই মায়ের নিকট দিলাম।

৺কাশীধাম হইতে বেদান্ত পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া দেশে আসিয়াছি—দেশে-বিদেশে এই কথা প্রচারিত হইয়া গেল। বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম দাদামহাশয় যে রাজপরিবারের পৌরোহিত্য করিতেন, আমার ভাগ্যচক্র আমায় আর্থিক উন্নতির প্রলোভনের মধ্যে ফেলিয়া, আমার ইহ-পরকাল দুই-ই ডুবাইয়া দিবার জন্য, সেই রাজপরিবারের পৌরোহিত্যের মাঝখানে

আমাকে বসাইয়া দিল। রাজ-পৌরোহিত্য লাভের পরই, রাজ-অনুরোধে পড়িয়া বাবা এক বিশিষ্ট ধনী জমিদারের ভোগ-বিলাস মধ্যে পরিবর্দ্ধিত, আদরে প্রতিপালিত জমিদার-কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিলেন। বিষয়ীর সহিত আমাদের বংশের এই প্রথম সম্বন্ধ স্থাপন। বিষয়-বুদ্ধি-পরিচালিত ব্যক্তির মধ্যে পড়িয়া, ভোগীর সংসর্গে থাকিয়া যোগিগণ যেমন আপনার ক্রম-অবনতির পথে প্রতি পলে অগ্রসর হন, স্বেচ্ছায়-অনিচ্ছায় স্বপথভ্রষ্ট হন, আমারও তাহাই হইল। শিক্ষার ভিত্তি কর্ম্মের সঙ্গে সুদৃঢ় হইতে না হইতে ভোগী হইয়া পড়িলাম; বিষয় সংস্পর্শে স্বপথ, স্ববৃত্তি, স্বধর্ম্মচ্যুত হইলাম। আদর্শ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম লইয়া, সনাতনের সেবা করিতে পারিলাম না, বর্ণাশ্রমের গুরু হইয়া তাহার মর্য্যাদা রাখিতে পারিলাম না। সেই ভোগ-বাসনার মধ্যেই আমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রের নামকরণ হইল 'দেবদাস'।

রাজ-পৌরোহিত্যে বৃত হইবার পর রাজ-চতুষ্পাঠীর ভার আমার উপরেই পড়িয়াছিল। সময়ের স্বল্পতার জন্য সব সময় দেশে যাইতে পারিতাম না বলিয়া আমার স্ত্রী পুত্র রাজ-বাড়ীর নিকটে আমার জমিদার শ্বশুর মহাশয়ের বাড়ীতেই থাকিত। আমার পত্নী আজীবন ভোগে লালিত-পালিত হওয়ায় নিষ্ঠাবান্, সংযমশীল, ত্যাগ ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের কঠোরতাময় সংসারে—

শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবার জন্য শ্বশুরবাড়ীতে বাস করা কারাদণ্ডের মতই মনে করিত। উদার-প্রকৃতি সার্ব্বভৌম দাদামহাশয়ের সম্পত্তি আমার আয়ত্তে ও কর্ত্তৃত্বে আসিয়াছে। আমার ভোগের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার আয়ও বাড়াইয়া তুলিয়াছি। রাজ-পৌরোহিত্যের অপার কৃপায় অর্থ আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লয়—আমাকে চেষ্টা করিয়া অর্থের উপাসনা করিতে হয় না। বিবেক-বুদ্ধির কৃপায়, আমার প্রাক্তন সুকৃতির বশে, পিতামাতার আশীর্ব্বাদে এক দিন নিজের জীবনের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম,—ভোগের চক্রে, অর্থের কুহকে পড়িয়া পিতামাতার মুখের দিকে না চাহিয়া, পিতার বার্দ্ধক্যে সেবা সেবাশুশ্রূষা করিবার অধিকার পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছি—নিজের উদ্দেশ্য সমূলে নষ্ট করিয়াছি! নারীর রূপজ মোহে আবদ্ধ হইয়া বংশ-মর্য্যাদার হানি করিয়াছি—পুত্রের পিতা হইয়াও, পরের সন্তানকে আপনার সন্তান-জ্ঞানে শিক্ষা দিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াও, সে কর্ত্তব্যপালনে বিশেষ ত্রুটি করিতেছি। আপনার সন্তানের সংশিক্ষার—জাতীয় শিক্ষার, স্বধর্ম্ম ও স্ববৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া, তাহাদিগকে প্রথম জীবনেই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য আচার-পরায়ণ দেখিয়াও তাহার প্রতিকারের কোনও উপায় করিতেছি না। তখন আমার জীবনের গতি ফিরাইবার জন্য বহুদিন পরে পিতামাতার শ্রীচরণ-প্রান্তে আসিলাম।

দশ বৎসরের মধ্যে আমার দেশে আসিবার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। এই সময়ের মধ্যে সেই বৃদ্ধার—বাবার পিসীমাতার মৃত্যু হইয়াছে। আমাকে একবারমাত্র দেখিবার সাধ অপূর্ণ রাখিয়াই তিনি অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে আসিয়া তাঁহাকে দেখিবারও আমার সময় হইল না। আমার চরম উন্নতির কথা বোধ হয় ইহাতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন। মনুষ্যত্ব আমার হৃদয়ের পাপস্তূপের মধ্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। মনুষ্যত্বের অমিত শক্তিও বুঝি সে ভার ঠেলিয়া উঠিয়া, আমাকে আবার মানুষ হইবার পথে টানিয়া আনিতে পারে নাই।

৫

একটি পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণাধার—পবিত্র জীবনের প্রথম সূত্রপাত আমার জীবনের কতকটা গ্লানি, কতকটা দুঃখের ভার অপসৃত করিয়া দিয়াছিল। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ উমাদাস ভাইজীবনকে দেখিয়া মনে হইল, পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের অসীম শক্তি, অপার মহিমা, অনন্ত পবিত্রতার মধ্যে থাকিয়া সে তাহার চিত্তবৃত্তিকে প্রবল অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া, বেদের গূঢ়ার্থ বুঝিবার জন্য জীবনের সমস্ত লক্ষ্য এক করিয়া, জ্ঞানের মূর্ত্তিতে আমাদের গৌরব,—আমাদের বংশের গৌরব বর্দ্ধন করিতে

তাহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। কনিষ্ঠের অপূর্ব্ব ভ্রাতৃ-ভক্তিই আমার জীবনের ক্রম-অবনতির দারুণ দুঃখের জ্বালা হইতে আমায় পরিত্রাণ করিয়াছিল,—আবার মানুষ হইবার পথে আমাকে টানিয়া আনিয়াছিল। তাহার সৌজন্য, তাহার প্রাণের আগ্রহ আমাকে জীবনের গতি ফিরাইয়া লইতে বাধ্য করিয়াছিল। আমি যেন মন্ত্রাবিষ্ট হইয়াই তাহার উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমার জীবনের পথভ্রষ্ট উদ্দেশ্যকে আবার নূতন করিয়া গঠন করিতে, তাহার উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিশাইতে প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলাম। যখন আমার মনের অবস্থা এই প্রকার, সেই সময়ে আমাদের দুইটি ভাইকে অভিন্ন-হৃদয় হইয়া থাকিবার আশীর্ব্বাদ করিয়া, বংশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিবার উপদেশ দিয়া, বিদেশাগত ছাত্রদিগকে পুত্রাপেক্ষা যত্নে প্রতিপালিত করিতে আদেশ করিয়া, এবং বংশের যে কেহ পূর্ব্বপুরুষ-স্থাপিত চতুষ্পাঠীর আচার্য্য হইবার যোগ্য হইয়া পূর্ব্বপুরুষের অক্ষয় কীর্ত্তি স্মরণীয় করিয়া রাখিবে, সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা দিবে, তাহাকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করিবার মত শক্তি সঞ্চয় করিয়া তবে গৃহী হইবার উপদেশ দিবে—এই সব মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া আমাদের পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী সাবিত্রীলোকে গমন করিলেন। বলিতে ভুলিয়াছি, সার্ব্বভৌম দাদামহাশয়ের প্রদত্ত যে অর্থ আমি ৺কাশীধাম হইতে আনিয়া মায়ের নিকট

রাখিতে দিয়াছিলাম, উমাদাসের অসাক্ষাতে তাহাও আমাকে দিয়া, যাবতীয় বিষয়-রক্ষার ভার আমারই উপর দিয়া তিনি সর্ব্বশেষে বলিয়াছিলেন,—"বাবা শ্যামাদাস, যোগ্য পুত্র তুমি, অন্তিম সময়ে তোমাকে আর অধিক কি বলিব; তবে জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করি, যোগ্যের পুরস্কার দিয়া চিরদিন যিনি এই সৃষ্টি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তিনিই তোমায় পুরস্কার দিবেন, ইহা জানিয়াও, বাবা শ্যামাদাস, মা আমি, আমার শক্তিতে যতটুকু পারি তাহা না দিলে যে আমার তৃপ্তি হইবে না— আমি পরলোকে গিয়াও শান্তি পাইব না;—তাই আমার ইহপরলোকের তৃপ্তির ধন, শান্তির ধন উমাদাসকে তোমায় দিয়া, ভ্রাতৃ-ভক্তির মঙ্গল-বর্ম্মে তোমাকে আবৃত করিয়া পরমানন্দে পরপারের পথে যাইতেছি। সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, মান-অভিমান সমজ্ঞান করিয়া বিশ্বের হিতসাধন করিও। দয়াময় তোমায় সেই শক্তি দিন, এই প্রার্থনা করি।" মাতার সেই অন্তিম সময়ের কথাগুলি আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধশান্তির পরই পিতাঠাকুর পিতৃপুরুষের স্থাপিত চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাকে 'প্রতিষ্ঠান' আখ্যা দিয়া তাঁহার পৈতৃক যাবতীয় সম্পত্তিই সেই প্রতিষ্ঠানের সেবার জন্য অর্পণ করিয়া আচার্য্যরূপে আমাকে রাখিয়া উমাদাসকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ-

পর্য্যটনে বাহির হইলেন। পরে, বহু তীর্থ দর্শন করিয়া সর্ব্বশেষে উমাদাসের বেদপাঠের সুবিধার জন্য ৺কাশীধামেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৬

আমার পত্নীকে তখনও আমাদের দেশে আনা হয় নাই; এখন আর না আনিলে চলে না। বাড়ীতে ৪০ জন ছাত্র। তাহাদের লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। বিদেশাগত ছাত্রেরাই তাহাদের মধ্যে পালা করিয়া রন্ধন ও ঠাকুরসেবার ভার লইয়াছে। যাহারা আমার প্রতিপাল্য হইয়া—আমার মুখ চাহিয়া—আমারই হস্তে জীবন সমর্পণ করিয়াছে, মাতা-পিতার স্নেহের বন্ধন হইতে দূরে বিদ্যাশিক্ষার জন্য আমার আশ্রয়ে আসিয়াছে, তাহাদের প্রতি আমি এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। মনে প্রাণে দারুণ অশান্তি ভোগ করিতেছি। সাহায্যের আশায়, আমার কর্ত্তব্য-ত্রুটি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমার পত্নীকে আমার গৃহে আনিলাম।

ভাবিয়াছিলাম এক, হইল আর! পত্নীর প্ররোচনায় পড়িয়া, তাহার কষ্টের লাঘব করিতে যাইয়া, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-গৃহে পাচক ব্রাহ্মণের হাতে দেবসেবার ভার—দেবতার ভোগের ভার অর্পিত হইল। পিতার পুত্রাধিক স্নেহে পালিত বিদ্যার্থী-

দিগের জন্য সংসার হইতে পৃথক্ ব্যবস্থা হইল। বহুকাল হইতে যে বংশে পুত্রাধিক যত্ন পাইয়া, পরকে কিরূপ যত্নে প্রতিপালন করিয়া আপন করিতে হয় এই শিক্ষালাভ করিয়া, যাঁহারা দেশের ও দশের মঙ্গল বিধান করিতেন, সেই বংশের যোগ্য পুত্র হইয়া, কৃতিমান্ পুত্র হইয়া পত্নীর অনুরোধে—পত্নীকে যত্ন করিতে যাইয়া—তাঁহাদের যে ব্যবস্থা করিলাম,—তাহাতে ব্রাহ্মণের সদাচারে ও কুলাচারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছি বলিয়াই মনে হইল। দারুণ অশান্তিতে, আত্মগ্লানিতে এই ভাবেই প্রায় দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি—বিলাস-বাসনায়, স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য—তুষ্টির জন্য অন্যায় খরচও অনেক করিয়াছি। শ্বশুরকুলের অনুরোধে এবং স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছার বাধ্য হইয়াই পুত্রকে দেবভাষার পরিবর্ত্তে রাজভাষায় পারদর্শী করিয়া সভ্য বাবু প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে গৃহে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছি।

৭

বেদান্ত-তীর্থ উপাধিতে ভূষিত হইয়া দশ বৎসর পরে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ উমাদাস ভাইজীবন দেশে ফিরিয়া আসিল ; বাবা আর দেশে ফিরিলেন না, উমাদাসের পঠদ্দশাতেই তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। দেবদাস বি-এ পাশ

করিয়া এম-এ, পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রতি পরীক্ষায়ই প্রশংসার সহিত পাশ করিয়াছে এবং ইংরেজী আদব-কায়দাও চূড়ান্ত দুরস্ত করিয়াছে। আমাদের সংসারের প্রাচীন ভাব, চাল-চলন যতটুকু লোকলজ্জার ভয়ে সাগ্রহে রক্ষা করিতেছিলাম, দেবদাসের তাহা আদৌ পছন্দ হইত না। তাহার অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিয়া বেশ বুঝিতে পারিতাম, আমার ব্যবহার সে অসভ্যতাপূর্ণ বলিয়া মনে করিত। দেবদাস বলিত, "প্রাচীন লোক সব কুসংস্কারে আবদ্ধ। জীবনের উন্নতি কোন্ পথ দিয়া কেমন করিয়া হয় তাহা তাহারা জানে না, সভ্যতা, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের উন্নতির দিকে তাহাদের কোনও লক্ষ্য নাই। আমাদের দেশের একটা খুব বড় সংস্কারের আবশ্যক হইয়াছে, আর সে সংস্কারের জন্য একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব বিশেষ আবশ্যক।" তাহার এই সব কথা শুনিয়া, তাহার হাবভাব দেখিয়া বুঝিতাম, সে আমাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, আমাদের প্রাচীন মর্য্যাদা—প্রাচীন জ্ঞান—অতীতের ইতিহাস জানে না, শেখে নাই। অতীতের গৌরব যে আমাদের হস্তে পড়িয়াই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সে কখনও শোনে নাই। আমরা যে তাহারই মত গোপন তাচ্ছিল্যে সে পুণ্যের সেবা—অতীতের গৌরব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, পতিত হইয়া জীবন যাপন করিতেছি, তাহা সে জানে না; কত শত কোটি জীবন

জন্ম প্রাত করিয়া আমাদেরই আদি পুরুষেরা চরম জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায় সফলকাম হইয়া তাহারই অক্ষয় ফল আমাদের ভোগ করিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন; আর তাহারই অপচয়ে আমরা যে পাপ সঞ্চয় করিতেছি, তাহার জন্য শত জন্ম প্রাণপাত করিয়াও আমাদের সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার অধিকারী হইতে যে প্রায়শ্চিত্ত আমাদের প্রত্যেক বংশধরকেই করিতে হইবে, তাহা সে জানে না,—কেহ তাহাকে সে শিক্ষাও দেয় নাই।

দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে উমাদাস ভাইজীবন মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হইয়াছে, পুত্র দেবদাস সুখ্যাতির সহিত এম-এ পাশ করিয়াছে। তাঁহাদের বিবাহের জন্য দেশের চারিদিক হইতে লোকজন যাতায়াত করিতেছে। ধনীর দল পুত্র দেবদাসের বিবাহের জন্য প্রচুর অর্থের লোভ দেখাইয়া আমাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন; প্রাচীনের দল ভ্রাতা উমাদাসের বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতেছেন। এমন সময়ে আমার শ্বশুর মহাশয়, এক ধনী জমিদারের কন্যার সহিত উমাদাসের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত না হওয়ায় তিনি অপমান বোধ করিলেন। কিন্তু উপায় নাই। আমার জীবনের উপর দিয়া চূড়ান্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছি বলিয়াই, যথাসময়ে এক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের পরম

সুন্দরী কন্যার সহিত ভ্রাতার বিবাহ দিলাম, অর্থের কুহকে পড়িয়া বংশের শেষ স্মৃতিটুকু মুছিয়া ফেলিবার সহায়তা করিতে সাহস হইল না। উমাদাসের বিবাহের সময় আমার শ্বশুর-বাড়ীর সকলেই, এমন কি আমার পত্নীও, অসুখের ভাণ করিয়া, শুভকার্য্যে যোগদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করেন নাই। দেবদাসের বিবাহের সময়ও যদি ভগবান্ আমার পত্নীর ও আমার শ্বশুরকুলের সেইরূপ মতিগতি দিতেন, তাহা হইলে আমার ভবিষ্যৎ কতকটা হয় ত শান্তিতে কাটাইতে পারিতাম; কিন্তু বিধাতার বিধানের অন্যথা করিতে যে বিধাতারই শক্তি নাই। আমাকে না জানাইয়া—আমার মতের অপেক্ষা না করিয়া, ভাল-মন্দ বিচার করিবার কণামাত্র ভার না দিয়া, আমার একমাত্র পুত্রের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করিতে আমার পত্নী ও শ্বশুর মহাশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। আমার একমাত্র পুত্র, আমার বংশের আলোক,—আমার পিতৃপুরুষের শান্তির স্থল দেবদাসকে অর্থের বিনিময়ে এক জমিদার-কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর আমরা দুই ভ্রাতা সংবাদ পাই-লাম। আত্মগ্লানিতে আমার হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। আমার চিরপোষিত উদ্দেশ্যের মূলে কুঠারাঘাত হইল।

৮

স্বর্গীয় সার্ব্বভৌম দাদামহাশয় যে রাজবাড়ীতে পৌরোহিত্য করিতেন, আমিও সেই রাজবাড়ীতেই চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের কার্য্য ও পৌরোহিত্য করিয়াছিলাম। সেই রাজবাড়ীর সকলেই আমাদের চিনিতেন, ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। এখন সে সব প্রাচীন মর্য্যাদা রক্ষার ভার যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, তাঁহাদের রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চতুষ্পাঠীর পরিবর্ত্তে কলেজের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই রাজবাড়ীর কলেজের প্রধান শিক্ষকের পদ আমার পুত্র দেবদাসের জন্য স্থির করিয়া তাহার মাতামহ একখানি পত্র দিয়াছেন। ঐ পদের বেতন ২৫০ টাকা। চাকুরী করা তখনকার দিনে ব্রাহ্মণের পক্ষে অতি হেয় কর্ম্ম বলিয়া সকলের ধারণা ছিল; সেই জন্য, এবং দেবভাষা সংস্কৃত তাহার আদৌ শিক্ষা হয় নাই, ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার রক্ষা করিতে সে আজ পর্য্যন্ত চেষ্টাও করে নাই, তাহাতে তাহার আস্থাও নাই—এই সব জানিয়া তাহাকে চক্ষের বাহিরে, অধঃপতনের শেষ সীমায় পাঠাইতে উমাদাসের আদৌ ইচ্ছা হইল না। উমাদাসের ইচ্ছা নাই বুঝিতে পারিয়া আমিও দেবদাস ও তাহার মাতার এবং মাতামহের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলাম না। একেই ত বাবুর আচার, সাহেবী কায়দা-করণ, তাহাকে অভি-

ভূত করিয়া বংশ-মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে দেয় নাই; তাহাতে আবার চাকুরীজীবী হইলে আমার সব আশা সমূলে নষ্ট হইবে; এই ভয়ে তাহাকে সেখানে পাঠাইলাম না।

আমাদের দুই ভ্রাতার এই ব্যবহারে আমার পত্নী সুখী হইতে পারে নাই। এই সময় হইতেই তাহার দুর্বিনীত ব্যবহার প্রতিদিন আমাকে অধীর করিয়া তুলিতে লাগিল। দেবোপম ভ্রাতা উমাদাস যেন তাহার শত্রুর কার্য্য করিয়াছে,—তাহার জ্ঞাতির কার্য্য কলে-কৌশলে সম্পাদন করিতেছে,—এই ধারণায় সংসারের কূটনীতির মধ্যে যে কখনও নাই তাহাকে অভিভূত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। অহর্নিশ দুশ্চিন্তা-বিষ ভোগে আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। মাসাধিক কাল শয্যাশায়ী থাকায় সংসারের যাবতীয় কর্ত্তৃত্ব ও খরচপত্রের ভার উমাদাসকেই দিতে চাহিলাম। কিন্তু সরলহৃদয় উমাদাস আমার ইঙ্গিতের আভাষ মাত্র বুঝিতে পারিল না। বশীভূতা হইয়া সে আমাকেও তাহার বদ্ধ ধারণায় সংসারের ভ্রূকুটি-কুটিল আনন ত কখন দেখিতে হয় না। উমাদাস যে 'অনাসক্ত অনু-রাগী সংসারী সংসার-ত্যাগী' এই চক্ষেই সংসারকে দেখিয়া আসিতেছে। বিধাতা বিচিত্র বিধানে তাহার চরিত্র গঠিত করিয়া আমার পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান রক্ষা করিতে, আমার ন্যায় পতিতের উদ্ধার করিতে, আমার সন্তানকে সনাতন

ধর্ম্মে আস্থাবান্ করিতে, আমার পত্নীর মতিগতি ধর্ম্মের দিকে টানিয়া আনিয়া তাঁহার লীলার পূর্ণ বিকাশ করিলেন। আমি আমার পত্নীর ব্যবহার জানি বলিয়া পুত্রের ঘৃণিত দৃষ্টির উপর আমাকে জীবন অতিবাহিত করিতে হয় বলিয়াই উমাদাসকে সংসারের আয়ব্যয় কতটা কি, তাহা জানাইয়া দিতে চাহিলাম কিন্তু তাহার সরল হৃদয়, দৃঢ় বিশ্বাস, উদারতা তাহাকে সে পথে যাইতে দিল না। দেবদাসকে সংসারের সবই কিছু-কিছু এখন হইতেই জানান উচিত বলিয়া আমাদের যাবতীয় আয়ব্যয়ের ভার তাহাকেই দিতে হইবে বলিয়া, উমাদাস তাহার জীবনে আমার নিকট এই প্রথম অনুরোধ করিল। তাই যেন কেমন একটা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, ইহার ভাবী পরিণাম দেখিবার আশায়, বিনা বিচারে তাহার অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য যাবতীয় কাগজ-পত্র, টাকাকড়ি যে বাক্সে ছিল, তাহার চাবি উমাদাসকে দিয়া বলিলাম—"আমার জ্ঞান ও ধারণা মত তুমিই আমাদের সমস্ত সম্পত্তির ন্যায্য অধিকারী, তাই আমি ইহা তোমাকেই দিতেছি। এখন তোমার কর্ত্তব্য-জ্ঞানে—তোমার বিবেক-বুদ্ধিতে যাহা ভাল বিবেচনা কর, তাহাই করিতে পার;—তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই।" আমার বাক্যাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই উমাদাস পরমানন্দে দেবদাসকে তৎক্ষণাৎ সেই চাবি দিয়া, আমার পত্নীর সাক্ষাতেই

বলিল,—"বাবা দেবদাস, আমায় ধারণায় তুমিই ইহার ন্যায্য অধিকারী। শুধু ইহার কেন, আমাদের বংশের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের তুমি ভাবী হর্ত্তা-কর্ত্তা। ভগবান্ তোমাকে যে আমাদের বংশের যোগ্য করিয়াই পাঠাইয়াছেন, এই মহৎ বংশের সম্মান যে তোমারই পবিত্র হস্তে বর্দ্ধিত হইবে, ইহাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি যে তোমাকে আমাদের কুলের উপযোগী করিয়াই, আমাদের কুলধর্ম্ম রক্ষা করিবার শক্তি দিয়া, আমাদের বংশধর করিয়াই তোমাকে পাঠাইয়াছেন; তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার জন্যই তোমার মনের পরিবর্ত্তন কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? তোমার ন্যায় উপযুক্ত সেবক থাকিতে আমরা তোমার সেবা না লইব কেন? আমরাই বর্ণাশ্রমের—সংসার-ভিত্তির আদর্শ;—ব্রাহ্মণ—সনাতন ধর্ম্মের আদর্শ। আবার রীতিনীতি আমাদের নিকটেই—ব্রাহ্মণের নিকটেই আপামর সাধারণে শিক্ষা করে। ব্রাহ্মণ আমরা—আমরাই বর্ণশ্রেষ্ঠ—আমাদের কর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—আদর্শ কর্ম্মও নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই কর্ম্ম সম্পাদনে জীবন অতিবাহিত করিয়া—লোক শিক্ষার আদর্শ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম সার্থক করিতে হইবে। বর্ণাশ্রমের গুরুর কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। আপামর সাধারণকে সেই মহান্ কর্ত্তব্যে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের জীবনও সার্থক করিয়া

দিতে হইবে। বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া পরোপকার মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবেই, এই উদ্দেশ্য হৃদয়ে সর্ব্বদা পোষণ করিয়া আমাদের পরম পবিত্র এই পিতৃকুলের গৌরব রক্ষা কর—বৃদ্ধি কর; আমার এই অনুরোধ। আশীর্ব্বাদ করি, প্রার্থনা করি, সর্ব্বশক্তিমান্ তোমার হৃদয়ে এই পবিত্র ভাব ধারণ করিবার শক্তি দিয়া আমাদের পবিত্র] করুন। সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম তোমার মাতার পরামর্শে, আদেশে সম্পন্ন করিবে। প্রথম হইতে স্বমত চালনা করা নীতিবিরুদ্ধ। তুমি উপযুক্ত হইয়াছ—লেখাপড়া শিখিয়াছ—তোমাকে অধিক আর কি বলিব।"

একটি মন্ত্রশক্তি দেবদাসের অভিমান-পূর্ণ, অহঙ্কারপূর্ণ হৃদয়ের উপর আপনার মহিমা দেখাইয়া—মুগ্ধ করিয়া পাষাণে গড়া প্রাণহীন পুতুলের মত করিয়া দিল। সে যেন চিত্রের দৃশ্য বস্তুর মত—জড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। সে তাহার মুগ্ধ—ভয়-চকিত দৃষ্টি আর পৃথিবীর উপর হইতে উঠাইয়া লইতে পারিতেছিল না।

তাহার এই ক্ষণমাত্র অভিভূত অবস্থা আর কেহ লক্ষ্য করিয়াছে কি না, তাহাই দেখিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে সে আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার সেই মুখ এখনও আমার মনে আছে, হৃদয়ে আঁকা রহিয়াছে। সেই মুখ দেখিয়াই ত

আমার ধারণা হইয়াছিল, তাহার হৃদয়ে সৎশিক্ষার বীজ রোপণ করিলে, তাহাকে সৎসঙ্গে রাখিলে তাহার মালিন্য দূর হইয়া যাইবে, তাহার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন শক্তি জাগরিত হইয়া আবার তাহাকে মানুষ হইবার পথে আনিয়া আমাদের চির পবিত্র বংশের গৌরব রক্ষা করিবে।

সদ্‌বৃত্তি হৃদয়ে জাগরূক হইলেই, মন্দবৃত্তির একেবারে নাশ হয় না। বিবেকবুদ্ধি-পরিচালিত সদ্‌বৃত্তি তখন আজীবন আশ্রিত মন্দবৃত্তির সহিত হৃদয়ের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়া দেয়; আমার ক্ষেত্রবিশেষে—অধিকারীভেদে সদ্‌বৃত্তির নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া বিবেক-বুদ্ধির সংস্কারের উপর গা ঢালিয়া দিয়া কর্ম্মীর সাহায্যকারী হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইল না। দেবদাস তাহার পিতৃব্যের হস্ত হইতে কম্পিত হস্তে চাবি-কাটিটি লইয়া তাহার স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতার পাদমূলে রক্ষা করিয়া কাতরভাবে বলিল—"মা, পথ ভুলে অনেক দূর চ'লে এসেছি; আজ তা বুঝ্‌তে পেরেছি; কিন্তু আর কি ফের্‌বার শক্তি হবে? সে শিক্ষা যে—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া উমাদাস দৃঢ়তার সহিত বলিল, "নিশ্চয় হবে দেব! যে বংশে তোমার জন্ম, হবে না কেন? প্রাণে যদি প্রবল আগ্রহ হয়, তাহা হইলে তুমি অচিরেই পথ দেখিতে পাইবে। তোমার ভয় কি? তোমাকে পথ দেখাবার

জন্য ঐ ব্রাহ্মণ-প্রবর, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তোমার পিতৃদেব, হস্ত প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন। আমার ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয়ই সফল হইবে; তুমিই এই বংশগৌরব নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে পারিবে।”

দেবদাস একবার তাহার পিতৃব্যের মুখের দিকে চাহিল; দেখিল ব্রহ্মতেজে সে বদন উদ্ভাসিত। তাহার মনে হইল স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব তাহাকে বরদান করিবার জন্যই তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। ভক্তি-পরিপ্লুত চিত্তে সে তাহার পিতৃব্যের চরণ-বন্দনা করিল।

উমাদাস তাহার হস্ত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, “দেব! আমাকে নয়, আমার দাদাকে প্রণাম কর।”

দেবদাস আমার পদধূলি গ্রহণ করিল; আমি তাহাকে আমার বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম—আমি আমার হারানিধি ফিরিয়া পাইলাম। সে যে কি আনন্দ! কি প্রাণারাম আনন্দ!

আমার স্ত্রী অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার হৃদয়ে এ দৃশ্য একটি রেখাও অঙ্কিত করিল না।

৯

দেবদাসের জন্মতিথি উপলক্ষে যে দিন ব্রাহ্মণাদি ভোজন করান হয়, সেই দিন তাহার মাতা তাহাকে বাড়ীর মধ্যে আহার

করিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করা সত্ত্বেও সে আহার করিল না। কেবলমাত্র দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বলিল,—"প্রতিজ্ঞার পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত, আমার ব্রতের উদ্‌যাপন না হওয়া পর্য্যন্ত হবিষ্যান্ন ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করিব না, খাইব না। পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের বিদ্যার্থীদিগের যে ভাবে রাখিয়া,—যেরূপ যত্নে প্রতিপালন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, এখন সেইভাবেই আমার দিন অতিবাহিত করিব। তাহাদের রাজভোগ দিবার শক্তি যতদিন না আসিবে, ততদিন নিজের উদর পূরণের জন্য রাজভোগ গ্রহণ করিব না; পিতৃব্যের সহিত আমিও এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। ব্রাহ্মণসন্তান আমি ব্রাহ্মণ্যের শক্তিতে যতদূর পারি করিব; তাহার কণামাত্র তাচ্ছিল্যে নষ্ট করিব না। আর সে শক্তির সীমা কতদূর, তাহা দেখিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছি। মা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার অভীষ্ট পূর্ণ হয়।"

আমি আনন্দে অধীর হইয়া সেই মুহূর্ত্তে ইষ্ট স্মরণ পূর্ব্বক আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, আমার ইহ-পরকালের শান্তির ধন, আমার বংশগৌরব পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলাম, "বাবা দেবদাস, আমার পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদে—তাঁহাদের পুণ্যে—তোমার আশা, তোমার ব্রত, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে।" কিন্তু তাহার মাতার মনে আনন্দ হইল না, আশীর্ব্বাদ

করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না, পুত্রের মনের পবিত্রতা—জীবনের উদ্দেশ্য সে বুঝিতে পারিল না, বুঝিবার শক্তি বুঝি ছিল না ; তাই সেই পুণ্যদিনে, পুত্রের জন্মতিথির দিনে অভিসম্পাত উদ্দেশ্যেই বলিয়াছিল,—"মা হইয়া আমি তোমার ন্যায় হতভাগ্য পুত্রকে অভিসম্পাত করি, আমার মনক্ষুণ্ণের ফলে, যেন তোমাকে আজীবন পরমুখাপেক্ষী তোমার পিতৃব্যের পথই অনুসরণ করিতে হয়। যার মান অপমান জ্ঞান নাই, নিজকে প্রতিপালন করিবার শক্তি পর্য্যন্ত যার নাই, ভ্রাতৃ-অনুগ্রহে পালিত একটা ঘৃণ্য জীবনই তোমার জীবনের আদর্শ হইল, তখন আর তোমার ন্যায় মন্দভাগ্য পুত্রের মা হইয়া আমার জীবন-যাপনে আবশ্যক নাই। এমন ঘৃণ্য পুত্রে আমার আবশ্যক কি ? তুমি আমার পুত্র নও, আমি তোমার মা নহি।"

"মা, এ কথা ত তোমার অভিসম্পাত নয়, ইহা যে আমার পক্ষে 'শাপে বর'। মন্দভাগ্য পুত্র না হইলে কি হেলায় ব্রাহ্মণের পবিত্রতায় এতদিন বঞ্চিত থাকিতাম। সৌভাগ্যবান্ হইবার জন্যই ত মা, এত কঠোরতা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি। সৌভাগ্য কাহাকে বলে, আমার মা যে দিন বুঝিবেন, সেই দিনই তিনি পুত্রের মা হইবেন। ভাল-মন্দর বিচার যে দিন আমার মা বুঝিতে পারিবেন, সেই দিনই মাতৃ-আহ্বান পুত্রের নিকট পৌঁছিবে, তাহার পূর্ব্বে মনে করিব, আমি মাতৃহারা।"

দেবদাস এই কয়টি কথা তাহার মাতার অন্তরের প্রতি স্থানে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া আঁকিয়া দিয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রতিষ্ঠানে চলিয়া গেল। সামান্য এই কয়টি কথাতেই আমি আমার পত্নীর সম্যক্ পরিচয়, মনোভাব বুঝিতে পারি, তাহার এ ভুল আজীবনের। এই ভুলই আমার সংসারে অশান্তির কারণ। পূর্ব্বে ইহা বুঝিতে পারিলে বিষবৃক্ষ অঙ্কুরেই নাশ করিতাম, কিন্তু আমার প্রাক্তন-বশে তাহা বুঝিতে পারি নাই। বুঝিতে পারিলে হয় ত আমার পুত্রের চরিত্র এতটা দৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত হইত না। আমারই মত বাক্যবিশারদ হইয়া পুথিগত বিদ্যা অধিগত করিয়া পণ্ডিত আখ্যা পাইত। পাণ্ডিত্যের বিকাশ হইত না, আমারই ন্যায় ভোগে মজিয়া যাইত। ভগবান যাহা করেন, তাহাই মঙ্গলের জন্য।

দেবোপম ভ্রাতা উমাদাস জ্ঞাতিত্বের পরিশোধ লইবার জন্যই যেন আমার পুত্র তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র দেবদাসকে আচারের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল; এম্-এ পাশ করা ছেলের মাথা খাইবার ইচ্ছা করিয়াই সে প্রতিষ্ঠানের গুরু হইয়াছে, আমার পত্নীর এই ধারণা কিছুতেই তাহার মন হইতে দূর করিতে পারিলাম না, অনেক বুঝাইয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ্য ভাবের অভাবের, পবিত্রতার মর্ম্ম অবগত করাইতে পারিলাম না। উত্তরোত্তর সে অধিক ঘৃণার চক্ষে উমাদাসকে দেখিতে লাগিল।

পুত্রের উপর পর্য্যন্ত তাহার বিষদৃষ্টি পড়িল। পুত্রের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে তাহার অপমান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আর তাহার এ সংসারে থাকা চলিবে না, এ সংসারে থাকিলে সে আর বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না; এই সব অভিযোগ প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় আমার রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে বসিয়া অনবরত বলিয়া বলিয়া আমাকে অধীর করিয়া তুলিতে লাগিল। আমার যাবতীয় হিতোপদেশ তাহার বিষ তুল্য বোধ হইল। আমি নিরুপায় হইয়াই আমার পত্নীর নিকট স্বীকার করিয়াছিলাম—তাহার উদ্দেশ্য জানিতে পারিলে সেই মত কার্য্য করিব।

আমার পত্নী বলিল, "আমার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে। তোমারই ভালর জন্য আমার প্রাণ কাঁদে; তাই বলিতেছি, সময় থাকিতে একটা ব্যবস্থা কর। ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই আছেই, দিন থাকিতে তাহার ব্যবস্থা করিলে ভবিষ্যতে আর কোনও গোলযোগ হইবে না। এ কথায় আমার দোষ ধরিবে, তা জানি। ভগবান্ আমাদের যখন স্ত্রীলোক করিয়া, তোমাদের দাসী করিয়া, তোমাদের সেবার ভার দিয়া সংসারের সকল জ্বালা সহিতে পাঠাইয়াছেন, তখন আর সামান্য দোষাদোষের বিচার করিয়া নিজের পায়ে নিজে আর কেন কুঠারাঘাত করি। তাই বলিতেছি,

বিষয়ের ব্যবস্থা কর; নিজের-নিজের সকলেই দেখিয়া লউক। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, শরীরপাত করিয়া, দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া যাহা কিছু করিয়াছ, তাহাতে আর ভূত-ভোজন করাইবার প্রয়োজন নাই। চিরদিনই কি ঐ পৃথিবীর অলসের দল, বিশ্ব-কুঁড়ের দল ভোজন করাইয়া তোমার প্রাণাধিক ভ্রাতার অপব্যয়ের প্রশ্রয় দিবে। আর সহ্য করা যায় না, মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে। তাহার নিজের ক্ষমতায় উপার্জ্জন করিয়া যাহা পারে তাহাই করুক, তাহাতে কেহই তাহাকে বাধা দিবে না। বুকে বসিয়া দাড়ি উপড়াইবার আস্পর্দ্ধা দিবার আবশ্যক নাই। আমারই খাবি, আবার আমারই উপযুক্ত ছেলের পরকাল—উন্নতির আশা নষ্ট করিয়া দিবি। যে মানুষের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, তাহাকে সংসারে রাখিতে নাই,—তাহাতে সংসারের মঙ্গল নাই, অকল্যাণই আছে। একালে মানুষের ভাল করিতে নাই। কেহ তোমার ভাল করিলে,—উপকার করিলে, তুমি ভাব যেন সে তোমার উপকার করিতেই বাধ্য, সে উপকারের প্রত্যুপকার এখন নাই; যাহা আছে, তাহাতে তাহার মন্দ করা—উপযুক্ত পুত্রের মাথা খাইবার ষড়্‌যন্ত্র করা। তাই বলিতেছি, পৃথক্ হও, নিজের যাহা কিছু সব লও! পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায্য ভাগ উহাকে দিয়া বিষয়ের একটা 'বণ্টন-পত্র'

কর। যাহাতে ভবিষ্যতে আর কোনও গোল করিতে না পারে; তাহার মত পাকাপাকি করিয়া 'বণ্টননামা' রেজেষ্টারী করিয়া লও। বিষয়ের ব্যবস্থা হইলেই ছেলে হাতে আসিবে; নিজের হাতে আনিয়া শাসন করিয়া ঘরে তুলিয়া লইব। ছেলে বিসর্জ্জন দিতে পারিব না। টাকায় সব হয়, পর আপনার হয়, ছেলে ত নিজেরই। আমাদের অভাব কি? আমি দেখিয়াছি, তোমার এই বারের আনা টাকা, আর সাবেক মজুত বলিয়া যাহা তোমার হাতের লেখা সহীকরা একটা তোড়া তোমার সিন্দুকের এক পার্শ্বে রহিয়াছে, তাহা মোট-মাট পাঁচ লক্ষ টাকা। 'রাজজায়গীর' ত তোমার। তোমার নামেই রহিয়াছে। উহার আছে কি? যাহার আছে, তাহাকে ভোগ করিতে দিবে না। আমার ছেলেকে আমি ভাল খাওয়াইব, ভাল পরাইব, তাহা দেখিয়া সহ্য করিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত ভগবান যাহাকে দেন নাই, তাহার প্রতি আমার মায়া মমতা কি? সে কি মানুষ!"

আমার পত্নীর কথার উত্তরে বলিয়াছিলাম "মানুষ ত নয়ই। মানুষ হইলে, সুখ দুঃখ বুঝিত। মানে-অপমানে বিচলিত হইত, নিজের নিজস্বই বুঝিত। পরকে পরই ভাবিত। পরের ছেলেকে নিজের বলিয়া—নিজের করিয়া তাহার নিজের মাথা খাইত না। এই সব করিয়াই ত সেই সব হারাইতে

বসিয়াছে। মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ করিয়াছে! মানুষের বুদ্ধি থাকিলে—মানুষের মত কাজ করিলে আর আমার ভাই যে, তার আজ এ দশা হইবে কেন?" এই অভিনয় করিয়া সে দিনকার মত উদ্ধার পাইলাম।

১০

রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। 'রাজজায়গীর' সার্ব্বভৌম দাদামহাশয়ের প্রদত্ত। আমার নামে তাহার দানপত্র আছে, তাহাতে আমার ন্যায্য অধিকার কই? নাবালক দৌহিত্রের সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইলে যাহা করিতে হয়,—বিশেষ একটা প্রকাণ্ড জমিদারী রক্ষা করিতে হইলে সে ক্ষেত্রে যাহা করিতে হইয়াছিল, তাহাই করিয়া যোগ্যের হস্তে সম্পত্তি রক্ষার ভার দিয়াছিলেন মাত্র; এখন আমি কি তাঁহার প্রদত্ত সেই জায়গীর নষ্ট করিতে পারি? সে সম্পত্তিই যে নিজ শক্তিতে সনাতন পদ্ধতি রক্ষার যোগ্যতা লইয়া, যোগ্যের ভাগ্যলক্ষ্মী হইয়াই—যোগ্যের পুরস্কার রূপেই জন্ম লইয়াছিল। রাজার সম্পত্তি—রাজ অঙ্কলক্ষ্মী—কি অযোগ্য অপাত্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যোগ্যের পুরস্কার দিবার জন্যই ঐ সম্পত্তির সৃষ্টি। তাই আমাদের বংশের ও প্রতিষ্ঠানের রক্ষার ভার যে যোগ্যপাত্রে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম,

তাহাকেই ঐ সম্পত্তি যোগ্যের পুরস্কার রূপে প্রদান করিলাম। আর ভবিষ্যতেও বংশের যে কেহ প্রতিষ্ঠানের গুরুভার বহনে সমর্থ হইবেন, তিনিই উহা ভোগ করিবেন,—গুরুর আদেশে গুরুপরম্পরাক্রমে ঐ সম্পত্তির অধিকারী হইবেন, এই ব্যবস্থা করিলাম।

"রাজজায়গীর'এর সঞ্চিত মুনফা ও দাদামহাশয় প্রদত্ত নগদ টাকা লইয়াই ঐ পাঁচলক্ষ টাকা। তাহাতে ন্যায়তঃ আমার অধিকার নাই—উমাদাসেরই অধিকার। অযোগ্যের হস্তে পড়িয়া নষ্ট হয় নাই, হইবার নহে। যাহা যোগ্যের ভোগের, তাহা কি অযোগ্যের ভোগে ব্যয়িত হইতে পারে? তাই সেই অর্থ নিজের শক্তিতেই সঞ্চিত হইয়া এত অধিক হইয়াছিল। রাজ-পরিবারে পৌরোহিত্য করিয়া সংসারের খরচপত্র কুলাইয়া কিছু-কিছু করিয়া যাহা বাঁচিয়াছিল, তাহাতেই বাবা পৈতৃক বাড়ীখানির সংস্কার করেন। পূর্ণ ভোগ-বিলাসের মধ্যে পড়িয়া বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর কখনও পাই নাই। পুত্রকে কৃতী করিবার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া অনেক অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়াছি। পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ বিঘা লাখেরাজ। তাহা পিতাঠাকুর মহাশয়ই প্রতিষ্ঠানের বিদ্যার্থীদিগের সেবার জন্য দেবত্র সম্পত্তি করিয়া দিয়া গিয়াছেন; তাহাতে দেবাধিকার। আমাদের কাহারও

সে সম্পত্তিতে হাত নাই। পৈতৃক বাড়ীখানিতে আমরা বাস করিতেছি, আর তাহারই পার্শ্বে কতকটা বাস্তু একটী অশ্বত্থবৃক্ষে আবৃত হইয়া থাকাতে 'পতিত' ছিল; অশ্বত্থ ও নারায়ণে তখনও সমজ্ঞান ছিল বলিয়াই নারায়ণের উচ্ছেদ করিয়া সেখানে বাড়ী করিতে কেহ সাহস করে নাই। এই দুইটীই আমাদের পৃথক্-অন্নের বণ্টন-পত্রের মধ্যে আছে। আমাদের অতুল সম্পত্তির মধ্যে ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দের সন্ধিস্থলে—পবিত্র স্নেহ-ভক্তি সূত্রের বন্ধন স্বরূপ অমূল্য সম্পত্তি ঐ দুইটিই আমাদের বিভাজ্য। আমার পত্নীর মনস্তুষ্টির জন্য, বণ্টন-পত্রের বিষয়ে কিছু পরামর্শ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম—"তুমি যদি বল, তবে এই বাড়ীখানি উহাকে দিই, নতুবা উহার দাঁড়াবার স্থান থাকিবে না। কাহারও মুখ চাহিয়া কোন কাজ করায় আমি কখনও অভ্যস্ত নহি। ন্যায্য অধিকারে কাহাকে কখনও বঞ্চিত করি নাই, করিবও না, তুলাদণ্ডে পৈতৃক বিষয় বিভাগ করিব। এমন বণ্টন-পত্র করিয়াছি, তাহা দেখিয়া—তুমি স্তম্ভিত হইয়া যাইবে। সময়ে সব বুঝিতে পারিবে। এখন বল, তোমার কি অভিপ্রায়? কোনও দিন তোমার কথার তিলমাত্র অন্যথা করি নাই, আর এক্ষেত্রেও সহস্র লোকের অপমান সহ্য করিব, তবুও তোমার কথার অন্যথা করিব না। ভাবিবার সময় নাই, আজই সব শেষ করিব। নূতন সংসারের ভিত্তি আজই সূচনা

হইবে,—আজই তোমার কথামত তোমার শেষ অনুরোধে ‘বণ্টন-পত্র’ রেজিষ্টারী হইবে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সব জানিতে পারিবে, শীঘ্র বল, তোমার কি অভিপ্রায় ?”

“দাও তবে ঐটুকু ; না দিলে কোথায় থাকিবে, তোমারই ত ভাই বটে। আর দিলেও পুণ্য আছে, এই মনে করিয়াই দাও ; দয়ার পাত্র বটে, এই হিসাবেই দাও।”

“সে অশক্ত নয় ; মহাদেবের মত তার মূর্ত্তি, রুদ্রের মত তার তেজ ; পাছে আমার মর্য্যাদার হানি হয়, এই অছিলা দিয়াই আমার আশীর্ব্বাদটুকু আদায় করিয়া লয়। ভাল মন্দ, লাভ-লোকসানের দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। মানুষে কি এমন পারে, না এমন হয় ? আমি বুঝি সব, কিন্তু মনের আগুন এতদিন মনে চাপিয়া রাখিয়াছিলাম ; এবার সে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সে বলে ‘অপ্রতিগ্রাহী হইয়া বংশের পূর্ব্ব-মর্য্যাদা চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিবে !’ সে কি আমার—তোমার দয়ার দান এই পৈতৃক বাড়ীখানি লইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় ? এই বাড়ীর তুল্য-মূল্যের পার্শ্বের ঐ যে দেখিতেছ অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে বাস্তু, ঐটাই আমাদের থাক্, আর এই বাড়ীখানি নিয়ে সে বাস করুক।”

“তাই কর, তোমার চেয়ে কি আর আমি বেশী বুঝি ?”

“ও কথা বলো না, তুমিই আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে

দেখিয়ে দিয়েছ। ছেলে যে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, এর প্রতি-বিধান আমি এতদিন কিছুই করিতে পারি নাই। তুমিই তা দেখিয়ে দিয়েছ। দয়াময় মুখ তুলে চেয়েছেন, তিনিই আমাকে শক্তি দিন, আমি যেন আমার কর্ত্তব্য পালন কর্ত্তে পারি।"

লেখাপড়া সমস্ত শেষ করিয়া, একবার প্রতিষ্ঠান-গৃহে যাইয়া উমাদাসকে বলিলাম,—"ভাই, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া আমাদের সমস্ত বিষয়ের একটা ব্যবস্থা করিয়াছি। তাহা রেজিষ্টারী করিব। আজ দুই ভাইকেই একবার রেজিষ্টারী আফিসে যাইতে হইবে। দেবদাসকে উৎসাহিত করিয়া ব্রাহ্মণের আচারের মধ্যে ফিরিয়া যাইবার জন্য, আর তোমার চির উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি আরও দৃঢ় করিবার জন্য একটু জটিল করিয়াই বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়াছি। রেজিষ্ট্রার তোমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তরে বলিও—'আমি আজীবন বিষয়ের কিছুই জানি না, দাদাই জানেন; তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা আমার অবশ্য পালনীয় ও স্বীকার্য্য।' আর একটি আমার অনুরোধ আছে—অনুরোধ কেন ভিক্ষা আছে;—বল, তাহা যতই কঠিন হউক, পূরণ করিবেই স্বীকার কর। জীবনে কখনও কোনও দিন কোন কথা বলি নাই, কোন অনুরোধ করি নাই। আজ আমার একটা ইচ্ছা পূরণ কর, তাহাতে আমার হৃদয়ে শান্তি ফিরিয়া আসিবে, শান্তির সঙ্গে-

সঙ্গে আমার স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া নবীন উৎসাহ পাইব, বড় আনন্দিত হইব।"

"দাদা, 'অনুরোধ' —'ভিক্ষা' এ সব না বলিয়া আদেশ কর, 'করিতেই হইবে' বল, কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের আদেশ চিরদিন সমান ভাবে তাহার শক্তি লইয়া এ মরজগতের গুরুর স্থান অধিকার করিয়া আছে। তোমার আদেশে প্রাণ দিতে পারি, প্রতিষ্ঠানের মায়াও ত্যাগ করিতে পারি ; অন্য কথা অতি তুচ্ছ।"

"রেজিষ্টারী আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সন্ধ্যার সময় বাড়ীর সকলের সাক্ষাতেই তোমাকে বলিতে হইবে, 'দাদা, আজ হইতেই তবে বণ্টন-পত্রের সর্ত্ত অনুযায়ী কার্য্য হউক।' সুধু এই কয়টি কথা। এই কয়টি কথাতেই আমার যথেষ্ট উপকার হইবে। আমার পত্নীর মতি পরিবর্ত্তনের জন্য—তাহার গর্ব্বের মূলে—তাহার চিরভ্রান্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতে অন্য উপায় পাই নাই বলিয়াই অবশেষে তোমার মুখে, কনিষ্ঠের মুখে এই মহামন্ত্র-মহৌষধির নির্দ্ধারণ। আমার প্রাক্তন দুষ্কৃতিই আমার পত্নীরূপে আসিয়া আমার সংসারে অশান্তির বীজ বপন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। আমার কর্ত্তব্য বুদ্ধির উপর তাহার নিজের শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমার মনুষ্যত্বকে পশুজ্ঞানে বলি দিবার ইচ্ছা করিয়াছে। অধিক কি বলিব, আমার অস্তিত্ব

পর্য্যন্ত লোপ করিবার ইচ্ছায় নিজের প্রাধান্য বিস্তার করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেছে না। তাহার এই ব্যবহারে আমি কখন্ হয় ত আমার মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া ফেলিব, তাহার ঠিক নাই। তাই নিজের কর্ত্তব্যবুদ্ধি হারাইবার পূর্ব্বেই একবার তাহার মতির পরিবর্ত্তনের শেষ চেষ্টা স্বরূপ তোমাকে এই অনুরোধ করিতেছি। আমার অনুরোধ যত কঠিনই হউক, তোমাকে তাহা পালন করিতেই হইবে। বিষয়ের বণ্টন-পত্র দেখিয়াই সে তাহার স্বামীর অবস্থা বুঝিতে পারিবে, আর বলিতে পারিবে, তাহার এত শক্তি নাই, যে শক্তির প্রভাবে তাহার স্বামীর মনুষ্যত্ব নষ্ট করিতে পারিবে। আমি তাহাকে জানাইতে চাই, নারীর আজীবন প্ররোচনার ফলেও পুরুষের কর্ত্তব্যবুদ্ধির নাশ হয় না। আমি তাহাকে জানাইতে চাহি, সে যে অস্ত্র-প্রয়োগে আমার বুদ্ধি-নাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, তাহার সে অস্ত্র আমার উপর পতিত হইয়াও তাহার উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে ক্ষোভে, মর্ম্ম-যাতনায় অস্থির হইয়া তাহারই দিকে প্রতিগমন করিয়াছে। যেমন অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষিপ্ত কর্ণের ব্রহ্মাস্ত্র অর্জ্জুনের প্রাণঘাতী না হইয়া কর্ণেরই প্রাণঘাতী হইয়াছিল, তেমন তাহারই নিক্ষিপ্ত অস্ত্র তাহারই কুবুদ্ধির মূলোচ্ছেদ করিয়াছে। যাহাকে সহধর্ম্মিণী রূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাহার এই বিপরীত

ব্যবহার আমাকে দিবারাত্রি যে কি প্রকার শাস্তি দিতেছে, তাহা আর কাহার নিকট জানাইব; যিনি জানেন, তিনিই ত আমাকে উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন। এ উপায়ে তাহার মতি পরিবর্ত্তন হইবেই; সেই জন্যই ত তোমাকে আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। একই শোণিতে জন্ম হইয়াছে, উভয়েই পিতার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি, দেবভাষা শিক্ষা করিয়াছি, ব্রাহ্মণের আচার যতদূর সম্ভব, দেশকালের উপর দিয়া তাহাও পালন করিয়াছি। স্বামীর অতি আদরে, অতি যত্নে স্ত্রীর হৃদয় যে অপবিত্রতায় দূষিত হইয়াছে, স্বামীর কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় স্ত্রীর হৃদয়ের পবিত্রতার বিশুদ্ধ নির্ম্মাল্যে তাহা শোধিত করিয়া লইব। অন্যায়ের প্রশ্রয় প্রদান করিয়া যে ভুল করিয়াছি, সেই মহা ভুল সংশোধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই, তোমার ন্যায় ভ্রাতৃভক্তি-পরায়ণ ভ্রাতার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। 'বণ্টন-পত্র' বিষয়ের। ভ্রাতৃভক্তির—ভ্রাতৃস্নেহের বণ্টনপত্র নহে। তবে কেন ভাই বৃথা আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হইতেছ। পূর্ব্বপুরুষগণ যে ভাবে, যে নিয়মে সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া জীবন-যাপন করিয়াছেন, আমরাও সেই ভাবে, সেই নিয়মে, সেই সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সেই সনাতনের সেবা করিয়া জীবন-যাপন করিব। পিতৃপুরুষের স্থাপিত প্রতিষ্ঠান যাহাতে চিরদিন সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, লোক-

শিক্ষার ভার বহনে সক্ষম থাকে, তাহারই প্রাণপণ চেষ্টা আমাদের উভয়কেই করিতে হইবে। তাহারই জন্য যথাসর্ব্বস্ব দিতে হয়, দিব। বংশ-মর্য্যাদা চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, ভবিষ্যৎ সন্তানগণের সৎশিক্ষা-দীক্ষার জন্য—প্রতিষ্ঠানের আচার্য্য হইবার যোগ্য শিক্ষা লাভের জন্য আমরা বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া যাইব। আমাদের আজীবনের কল্পিত আশা আজ আমার চক্ষুর সম্মুখে মূর্ত্তিমান হইয়া সেই সৎ দিকে পরিচালিত করিতেছে। সেই জন্য তোমাকে আমার এই অনুরোধ।"

"দাদা,—হৃদয়ের অতি পবিত্র স্থানে পূজার আসন পাতিয়া মনে মনে এত দিন আপনারই পূজা করিয়া আসিয়াছি; যে ভাবে যখন যাহা আদেশ করিয়াছেন, ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, তাহাই আমার দেবতার আদেশ বলিয়া সানন্দে সম্পাদন করিয়াছি। অনধিকারী আমি, জানি না, কখন্ কোন্ ক্রটি করিয়াছি, তাহারই ফলে আজ এই শাস্তি। আজ আমার পরীক্ষার দিন। দাদা, যতই কঠিন হউক, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। বিচার করিবার শক্তি ত আমার নাই। আমি আপনার আদেশ জীবনে-মরণে পালন করিবই। পিতার শেষ আজ্ঞা যাহা জীবনের ব্রত, তাহা উদ্‌যাপন করিবই।" উমাদাস এই বলিয়া সেই দেবপ্রতিম পিতার তৈল চিত্রের দিকে

একদৃষ্টিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া চাহিয়া রহিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, অপার্থিব ভাব!

যথাসময়ে দুই ভ্রাতা রেজেষ্টারী আপিসে গিয়া রেজিষ্ট্রার মহাশয়ের নিকট, দলিল দাখিল করিলাম। যথাসময়ে আমাদের ডাক পড়িল। রেজিষ্ট্রার মহাশয় আমাদের 'বণ্টন-পত্র' পড়িয়া প্রথমে আমাকে উন্মাদ স্থির করিলেন। উমাদাসকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার মস্তিষ্ক বিকৃত কি না, কথনও উন্মাদ হইয়াছিলাম কি না। উমাদাসের কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না; অধিকন্তু স্বার্থের জন্য মিথ্যা বলিতেছে বলিয়া দু'একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। "উপযুক্ত লোকের মুখে আপনাদের সম্যক্ পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত এ দলিল রেজিষ্টারী করিতে পারি না, আপনারা উভয়ে অপেক্ষা করুন", বলিয়া তিনি নিজের কার্য্য করিতে লাগিলেন। সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া পুনরায় আমাদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের এখানে এমন কেহ পরিচিত আছেন কি না, যাঁহাকে আমি বিশেষরূপে জানি।" ভাগ্যক্রমে সে দিন যে সব লোক সেখানে কার্য্যোপলক্ষে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই আমাদের চিনিতেন। তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া রেজিষ্ট্রার মহাশয়ের ভুল ভাঙ্গিল, আমাদের 'বণ্টন-পত্র' রেজিষ্টারী হইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই দুই ভাই

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। আমার পত্নী 'বণ্টন-পত্রে'র মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া গৃহদ্বারেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। উমাদাস ভিতরে গিয়া আমার পত্নীকে উদ্‌গ্রীব দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—"দাদা, আজ হইতেই তবে 'বণ্টন-পত্রে'র সর্ত্ত অনুযায়ী কার্য্য হউক।"

তখন আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া এতদিনের ধৈর্য্যকে হারাইয়া অধীর হইয়া বলিলাম "চল ব্রাহ্মণী, চল গৃহিণী, চল সহধর্ম্মিণী, চল জীবনসঙ্গিনী চল—এ গৃহে আর আমাদের স্থান নাই, তোমারই যুক্তিমত—মন্ত্রণামত, তোমারই আদেশে বিষয় দুইভাগ করিয়াছি, বাড়ী উমাদাসকেই দিয়াছি। আর ঐ যে দেখিতেছ অশ্বত্থ বৃক্ষ, উহারই পবিত্র পাদমূলে আমাদের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। বাড়ী আর ঐ বাস্তু ব্যতীত আমাদের আর কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি নাই, তাহা ত তোমারই মধ্যস্থতায় বণ্টন হইয়াছে। যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই প্রতিষ্ঠানের। গৃহিণি, আর কেন এখানে? আজ হইতেই বণ্টন-পত্রের সর্ত্ত অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। তোমার ধারণায় যে চিরদিন পরের গলগ্রহ, পরমুখাপেক্ষী, যে তোমার সন্তান কাড়িয়া লইয়াছে, বিশ্বকে পর করিবার বিদ্যা শিক্ষা দিতেছে, তোমার এম-এ পাশ করা ছেলের মাথা খাইতে বসিয়াছে, সেই এ কথা বলিতেছে। তোমার

সে তেজ কোথায়, যে তেজে আমাকে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় উত্তেজিত করিতে, আমার ভাইকে পর করিবার মন্ত্র পড়াইতে। সেই তেজ সঙ্গে লইয়া চল, এ সংসারে তাহা আর রাখিয়া যাইও না; তাহা হইলে এই পবিত্র বংশের বংশ-ধরগণকেও হয় ত আমারই মত দিবারাত্রি শত বৃশ্চিকদংশন-জ্বালা সহ্য করিতে হইবে। চল গৃহিণী, চল জীবনসঙ্গিনী, সন্ধ্যার এই অন্ধকারে আমাদের জীবনের শেষ পথে।"

*　　*　　*　　*

এখন আমরা কাশীবাসী। গৃহ, গৃহিণী—সব পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি। গৃহ গিয়াছে—কাশী পাইয়াছি; গৃহিণী গিয়াছে—সহধর্ম্মিণী পাইয়াছি; বিশ্ব গিয়াছে—বিশ্বনাথকে পাইয়াছি।

উৎসর্গ

১

সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামপুরের একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। শ্রীমতী রমা দেবী তাঁহার একমাত্র কন্যা। সংসারে পিতা ও কন্যা ব্যতীত আর কেহই নাই। রমার মা অনেক-দিন পূর্ব্বে সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি লইয়া সতীলোকে গমন করিয়াছেন। রমার পিতার অবস্থা স্বচ্ছল, জমি-জমাও বেশ আছে। গ্রামের লোকের ধারণা, রমার পিতার প্রচুর অর্থ আছে; তাই তিনি অর্থের গর্ব্বে কাহারও খাতির রাখিয়া কোনও কথা বলেন না। তাই বলিয়া সীতানাথ যে কাহাকেও তাহার ন্যায্য মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত করেন, তাহাও নহে। সে কালের মত মন লইয়া সীতানাথ সদা সত্যের পথে থাকিতে, সত্যের সেবা করিতে, সরল ব্যবহারে—সাদা প্রাণে লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে বড় ভালবাসিতেন। তাই আজ-কালকার এই অন্তর-বাহ্য বিভিন্নতার যুগে—গোপনতার যুগে, তাঁহার সাদা প্রাণের সরল ব্যবহারের কেহ বড়-একটা প্রশংসা করিত না। সীতানাথ

এই উদার হৃদয় লইয়া সকলের সঙ্গে মিশিতে পারিতেন না বলিয়াই রমার আজ-পর্য্যন্ত বিবাহ দিতে পারেন নাই। রমার মাতা থাকিলে বোধ হয়, তিনি এতদিন চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যাকে অনূঢ়া রাখিতে দিতেন না। মাতৃহীনা রমাকে বড় আদরের মধ্যে মানুষ করিয়া পরের ঘরে পাঠাইতে সীতানাথ কেবলই কালবিলম্ব করিতেছিলেন। এই ত ছোট মেয়ে—আজ থাক্, কাল হবে, বুদ্ধিশুদ্ধি হোক্, এই সব ভাবিয়া নিজের মনে ওজর আপত্তি তুলিয়া, সীতানাথ একপ্রকার নিশ্চিন্তই ছিলেন। রমার বিবাহের জন্য প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর বলিত। কিন্তু তাহা শুনিয়া—ঐ প্রতিবেশীদের কথায় নাচিয়া কোন কায করাটা সীতানাথ আদৌ পছন্দ করিতেন না। কারণ তাঁর একটা ধারণাই ছিল যে, প্রতিবেশীরা সকলকেই গাছে উঠাইয়া 'মই'খানি কাড়িয়া লইতেই এমন উপদেশ দিয়া থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যে তাহারা সহৃদয়তা প্রকাশ না করিয়াও থাকিতে পারে না, এই কথাও সীতানাথ যে না বুঝিতেন তাহাও নহে। প্রতিবেশীদিগের মধ্যে সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সীতানাথের বড়ই অনুগত ছিলেন। সতীশচন্দ্র গ্রামের ডাক্তার। অতি দারিদ্র্যের মধ্যে সতীশবাবুর বাল্য-জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। একদিন সীতানাথের কৃপাদৃষ্টিতে পড়িয়া, সীতানাথের আশ্রয়ে আসিয়া সতীশচন্দ্র

এখন একজন খ্যাতনামা লোক হইয়াছেন, দশের মধ্যে এখন একজন হইয়াছেন। সীতানাথ সম্পদে-বিপদে কখনও সতীশকে বিস্মৃত হন নাই। সতীশচন্দ্র ও তাহার পত্নী কমলা, পিতার মত ভক্তি করিয়া, গুরুর মত শ্রদ্ধা করিয়া, সীতানাথের সেবায় প্রাণমন দিতে,—আজও—তাঁহাদের এই উন্নত অবস্থাতেও কুণ্ঠিত হন না ;—বরং নিজেদের ধন্যই মনে করেন। রমার সহিত কমলারও বড় সদ্ভাব। পিতৃমাতৃহীনা কমলা সীতানাথের কৃপাতেই আজ সতীশের গৃহিণী। কমলা সীতানাথকে বাবা বলিয়াই ডাকিত। সতীশচন্দ্র ও সীতানাথের ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া গ্রামের লোকে বলিত—"কে বলে সীতানাথের পুত্র নাই, তার পুত্রস্থান যে সতীশবাবুই অধিকার করিয়াছেন।"

সতীশের স্ত্রী কমলাকে সীতানাথ আপন কন্যার ন্যায় ভালবাসিতেন ; কমলাও সীতানাথকে পিতার মত ভক্তি করিত। রমার বিবাহের বিশেষ বিলম্ব হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, একদিন কমলা সীতানাথের নিকটে বলিল—"বাবা, রমার বয়সী সকলেই একেএকে শ্বশুরঘর কর্ত্তে দ্বিরাগমনে চলে গেল ; কারও কারও বা পুত্র-কন্যা হ'ল,—আর এখনও আপনি রমার বিয়ে দিলেন না।" কমলার কথায় আজ যেন সীতানাথের চমক ভাঙ্গিল। সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রমার বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি দেশ-বিদেশে পাত্রান্বেষণে

জীবনপাত করিবার উপক্রম করিয়া তুলিলেন। পাত্রের বাজার-দর হঠাৎ যে এমন আগুন হইয়া গিয়াছে, ইতঃপূর্ব্বে তাহা জানিবার সীতানাথের কোনও সুযোগই হয় নাই। সীতানাথের নানা চেষ্টার পর অনেক টাকার পরিবর্ত্তে,—যথাসর্ব্বস্বের পরিবর্ত্তে, অবশেষে একস্থানে বরবর পছন্দ হইল। বিবাহের দিনস্থির হইল, দুইদিন পরে বিবাহ,—সমস্ত আয়োজনও ঠিক ; —এমন সময় পাত্রের পিতার নিকট হইতে সংবাদ আসিল। দৈবজ্ঞ বলিতেছেন—'এই পাত্র-পাত্রীর মিলনে—শুভ-বিবাহ-ফলে তিনটী কন্যারত্ন ও একটীমাত্র পুত্র হইবে।' রমার পিতা যদি ভাবী দৌহিত্রী-রত্নত্রয়ের বিবাহের যাবতীয় ব্যয়-বহনে সম্মত হইয়া এখনই পাত্রের পিতার নিকট দশহাজার টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারেন, তবেই এ বিবাহ হইবে। নতুবা তিনি পুত্রের পিতা—এমন নিশ্চিত বিপদে পুত্রকে নিক্ষেপ করিতে নারাজ। ইহাতে অসম্মত হইলে সীতানাথ অপর পাত্রে কন্যাদান করিতে পারেন।' ইহার উত্তরে সীতানাথ বলিয়া পাঠাইলেন—'আমি জামাতা ক্রয় করিয়া কন্যার বিবাহ দিব না। টাকা দশ-বিশ হাজারের জন্য যায়-আসে না। অপাত্রে দান আমার কোষ্ঠীতে লিখে নাই।' কাজেই নির্দ্ধারিত দিনেও রমার বিবাহ হইল না। বিধি-বিড়ম্বনায় কন্যাদায় বুকে লইয়া সেইরাত্রেই সীতানাথ হঠাৎ শেষশয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য

হইলেন। শিরঃপীড়ায় বড়ই কাতর হইয়া সীতানাথ অন্তিমের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আর রমা—তাহার কথা আর কি বলিব। রমা ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সে যে এ বিপদে কি করিবে, কোথায় যাইয়া কাহার আশ্রয় লইয়া পিতাকে রোগ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবে, এই সব কর্ত্তব্য-বুদ্ধি তাহাকে যেন একেবারে ছাড়িয়া যাইতে চাহিল। কতক্ষণ পরে যে তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা সে জানে না। পিতার আর্ত্তস্বরে রমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। বড় কষ্টে অতি ক্ষীণকণ্ঠে সীতানাথ বলিলেন "রমা, মা, আর বুঝি বাঁচি না। একবার সতীশকে ডাক্।"

২

সতীশবাবু ও কমলা দেবী নিজের বাড়ীতে বসিয়া রমার সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিতেছিলেন। কমলা বলিতেছিল,—"শুনেছ, রমার সেখানে বিয়ে হবে না। তারা ছল ক'রে অনেক টাকা চেয়েছে। বাবা তাই বিরক্ত হয়ে তাদের বলে পাঠিয়েছেন যে, তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন না। রমার মুখখানা আজ বিষণ্ন দেখে, মনটা বড়ই খারাপ হয়েছে। তার সদাহাস্যময়ী সেই দেবীপ্রতিমার মত মুখখানিতে কালিমার একটু ছায়া দেখ্‌লেই আমার প্রাণে যেন কেমন একটা আঘাত

লাগে। তার বিয়ে হয়নি বলে যে তার দুঃখ, তা নয়। রমার যত দুঃখ দেশের এই দুর্দ্দশা দেখে, বঙ্গসমাজের এই কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির আকুল ক্রন্দনে। বাবা যেন কখন ভাবেননি যে, এই মেয়ের জাতকে মানুষ করা কেবল পরের ঘরে পাঠাতে, পরের দাসীবৃত্তি কর্ত্তে। তাই বাবার এখন এত কষ্ট হচ্ছে। এত আদরে কি মেয়েকে কেউ মানুষ করে? এদের জন্য সব যায় —মেয়ের জন্য বরের বাপের কাছে কন্যার বাপকে এত ছোট হতে হয় যে, তাকে মানুষে কেন যে কন্যার জন্ম দিয়াছে, তার পর্য্যন্ত কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য করে। অর্থের রাশি—আজীবন-সঞ্চিত অর্থ বরের বাপের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েও পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। তাতেও, দেব কি অসুর জামাই হবে—তার চরিত্র কোন্ পথ দিয়ে যাবে, এ জন্য বরের বাপ দায়ী নন্, দায়ী কন্যার কপাল। বেশ দেশ! বেশ সমাজ! বেশ সমাজের শাসন ও শিক্ষা।"

"কমলা, তোমার বুঝি বড্ড খারাপ লাগছে এই সবকে। যত ভাবছো তত নয়। এই মরা দেশের—মৃতপ্রায় বঙ্গসমাজের —এই ধ্বংসোন্মুখ বঙ্গের এখনও এমন শক্তি আছে, যাতে একদিনে এই সব কর্ম্মের গতি ফিরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তোমরাই তার প্রবল অন্তরায়। তোমরা যদি সব সময়ে আমাদের পশ্চাতে থেকেও তোমাদের কর্ত্তব্য পালন না কর,

সহধর্ম্মিণীর ন্যায্য প্রাপ্য ব্যবহার আমাদের না দাও, আমাদের কর্ত্তব্য মনে পড়িয়ে দিয়ে আমাদের উৎসাহিত না কর, তবে আর আমরা কি কর্ত্তে পারি! তোমাদেরই মুখ চেয়ে তোমাদেরই হাতে প্রাণটি সঁপে দিয়ে, আমাদের যত অপরাধের বোঝা বাড়্‌ছে। তোমাদের উপর আমরা যে বিশ্বাস মনে-প্রাণে অর্পণ করি—এই তোমাদের সমগ্র নারীজাতি—নারীশক্তি যদি তার অপচয় না করে, তবেই আমাদের সুদিন হবে,—সমাজ-দেবতার আসন অতি উচ্চে, অতি পবিত্রভাবে রক্ষিত হবে। যাক্ সে কথা। রমার সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস, বাবার আশীর্ব্বাদেই তার সব ভাল হবে। আমার সে বিশ্বাস যেন দয়াময় কখনও ভুল না করেন, আমার এই প্রার্থনা। প্রজাপতির কৃপার উপরই বিয়ের সমস্ত নির্ভর কর্ত্তে হয়। শত চেষ্টাতেও, লক্ষ টাকাতেও এ কায হয় না। এই পতি-পত্নীসম্বন্ধই বিশ্বের বিচিত্র নিয়মে বিধি-বদ্ধ। এখানে যতটুকু তাঁর উপর নির্ভর করা যাবে, ততটুকু আমাদের পক্ষে মঙ্গল। সব যোগাযোগ হইলেই হবে। এ যে ইহপরকালের সম্বন্ধের কথা। এখানে স্ত্রী-বুদ্ধিতে হবে না কমলা,—একটু প্রাণ-পোরা বিশ্বাসের আধার চাই।"

"তোমাদের ঐ এক কথা। যত দোষ এই আমাদের—স্ত্রীলোকের। তা স্বীকার কর্লেও যদি তোমার প্রজাপতি

ঠাকুরের কৃপায় রমার বিয়ে হয় ত হক্। বাবার শরীর দিনে-দিনে যে রকম হচ্ছে—তাতে আমার দিন-দিন ভয় বাড়্ছে। রমার ত কথাই নাই—সে যে বাবা বই আর কিছুই জানে না। বড় দুঃখে রমা বলে 'আমি যদি বেটাছেলে হতাম, তা'হলে বাবার এত কষ্ট হত না। আমার জন্য তাঁকে পরের দ্বারে পাত্র অন্বেষণের পরিবর্ত্তে হয় ত কোনও কন্যাদায়গ্রস্তের বিপদে আমাকে দিয়ে কত আনন্দ পেতেন।' রমার উচ্চ হৃদয় ও বুদ্ধি দেখে অনেক সময় অবাক্ হয়ে যাই। বাবার নিকট আমরা দু'জনেই মহাভারত পড়ি; কিন্তু রমা যেভাবে মহাভারত বুঝ্তে পারে, সে যেভাবে বোঝে, তা যেন সংসারের বাইরের কথা নিয়ে; তাতে জ্ঞান, বিচার, সেকালের একালের রীতি নীতির ব্যবধান এই সব থাকে। আর আমি যেন মহাভারতকে একটি খুব বড়রকম রাজারাজড়ার সংসারের কথার মত বুঝ্তে চেষ্টা করি ক্ষমা, দয়া, মান, সম্ভ্রম, বংশ, পাপ, পুণ্য, এইসব থাকে। এর বেশী আমার মাথায় আসে না। তাতেই বাবা বলেন—"আমার দুই কন্যা, জ্ঞান ও শিক্ষা, দুই দিকে ধাবিত। রমা চায়—জ্ঞান; তাই বিচারে, তর্কে, বিবেক-বুদ্ধির সঙ্গে যুদ্ধ করে। আর তুমি চাও—সরল বিশ্বাসে সংসারের পুণ্যপথ, পুত্র, পৌত্র, দশের সেবা, ধনদৌলত।" রমার স্বতঃই যেন কামনা-বাসনা নেই—তাতেই সুখ-দুঃখ

নেই। সে চায় মুক্তি। আর আমার মন যেন স্বতঃই কামনা বাসনায় পূর্ণ। তাই আমি চাই জন্মজন্মান্তর সুখে যাওয়া-আসা, স্বামিসেবা, পতিপুত্রবতী হয়ে সুখে থাকা।"

"রমা আগে আমার কাছে আস্‌তো, কত কথা বল্‌তো, গল্প বল্‌বার জন্যে কত জ্বালাতন কর্ত্ত। এখন আর আমার দিকে ঘেঁসে না কেন, বল ত? তোমরা দু'জনে মহাভারত পড়, আমি যেই এসেছি অমনি সব চুপ। রমা ত আগে এমন ছিল না। এখন যেন কেমন একটা সদা সঙ্কোচ-ভাব তার মধ্যে এসেছে। বয়োধর্ম্মে সবই আসে বটে, কিন্তু আজন্মের সরলতা কেন যাবে?—রমার কেন গেল বল্‌তে পার?"

"আমার বুদ্ধির দোষেই হয় ত এমনটা ঘটেছে। আমিই একদিন আমার বাঁচালতার জন্য তার মনে একটা ঘা দিয়ে এমন করে ফেলেছি। বাবার ক্রমাগত চেষ্টায় রমার বিয়ের কিছুই হলো না দেখে, আমি রমাকে বলি—'দেখ রমা, এক কায কর। আমার ত ছেলেটেলে হল না, হবেও না। তখন আমি মনে কচ্ছি কি তোর কুষ্ঠীখানা ওর কুষ্ঠীর সঙ্গে মিল করে, দেখে যদি পুত্রস্থান ভাল হয়, তবে আর তোকে পরের ঘরে যেতে দেব কেন ভাই! কেমন, তোর মত আছে ত? ডাক্তারবাবুকেই বিয়ে কর।' তাতে রমা কি বল্লে জান—'বড় ভাগ্যি করে দিদি, এমন দেবতার মত বর পেয়েছিস্‌, জীবনে

কখনও অযত্ন করিস্ না, ভক্তি করিস্। স্বামী নিয়ে স্ত্রীলোকের কি ঠাট্টা তামাসা কর্ত্তে আছে? আর কখনও এমন কথা আর কারও কাছে বলিস্ না।' সেই দিন থেকে সে আর তোমার কাছে বড়, পারত-পক্ষে ঘেঁসে না। রমার এই কটা কথা বলার ভাবে, তাহার ভক্তিনত চোখ দেখে, সেদিন সেই সময়েই মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনে হয়েছিল, রমা যেন তার জীবনের একটা সমস্যায় পড়েছে। স্বামী তুমি; তুমি আমার ইহ-পরকাল। তোমার কাছে মনের কথা গোপনেও পাপ। দেখ, আমার মনে হয়—রমা তার হৃদয়ের অতি নিভৃতে তোমায় পূজা করে, তোমায় ভালবাসে।"

৩

স্বামী-স্ত্রীতে ক্রমাগত একপক্ষকাল জীবনপাত-শুশ্রূষায়ও সীতানাথকে আরোগ্যের দিকে আনিতে পারিল না। আর রমা—তাহার কথা কি বলিব। এই সুদীর্ঘ পনর দিন সে ক্রমাগত অনাহারে ও জাগরণে পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার প্রাণ দিয়া সেবা করিতেছে। আহা, সে ত জানে না যে, মৃত্যুর মত ধ্রুব এ মর-জগতে আর দ্বিতীয় কিছুই নাই। সে যে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করিতে জীবের নিকট একদিন মাত্রই আসে, কোনও উপায়েই সে প্রত্যাখ্যাত হয় না। আপনার

হিসাব-নিকাশ আপনিই মীমাংসা করিয়া লইয়া যায়। আর কবিরাজ ডাক্তার, সে ত দূরের কথা; তাঁহারা রোগীর রোগের ঔষধ দিতে পারেন, কিন্তু আয়ু দিতে স্বয়ং বিধাতৃ পুরুষও পারেন না,—তিনিও মৃত্যুর নিকট আপনার চিরউন্নত শিরকে নত করিয়া—নিয়তির গতিতে আপনিই বাধ্য হইয়াছেন।

নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ যেমন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তার পরেই সব শেষ হয়; তেমনই এ বিশ্বের জীবজন্তু-গ্রামের জীবন-দীপ শেষ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে মানুষমাত্রেরই অতি-বিস্মৃতিময় যে মৃত্যু, তার ক্ষণপূর্ব্বে সংসার-স্মৃতি ফিরিয়া আসে। জীবনী-শক্তি তাহার চির অভ্যাসবশে কার্য্য করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া, একবার মাত্র অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থা হইতে জ্ঞানের সীমায় দাঁড়াইয়া মনের ব্যাকুলতায়—প্রাণের তীব্র জ্বালায়—অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় সংসারের নিকট চির-বিদায় লইতে বুঝি কৃতান্তের নিকট সামান্য মাত্র সময় ভিক্ষা করিয়াও ফিরিয়া আসে। সেই দুর্লভ সময়ে মায়িক মানুষমাত্রেই চির আকাঙ্ক্ষিত মনের অপূর্ণ বাসনাগুলি বলিয়াই আত্মীয়স্বজনের স্মৃতিমধ্যে একটি রেখাপাত করিয়া যায়। সে রেখা পাষাণে অঙ্কিত রেখার মত বহুদিনস্থায়ী। চিরন্তন প্রথায় সীতানাথেরও তাহাই হইল। পনরটি দিন-রাত্রি অতিবাহিত করিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ একবার জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আলোকের দীপ্তি—মৃত্যু-

শয্যাশায়ীর স্মৃতি ও শেষ আদেশ-পালনের ভার পড়িল,—সতীশ ও কমলার উপর।

সীতানাথ মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই, যেন সেই নিদ্রারই পূর্ব্বাবস্থার তন্দ্রাঘোরে বলিতে লাগিলেন—

"বাবা সতীশ, আমার জীবনের শেষ হয়ে এসেছে,—এ জীবনের প্রধান কর্ত্তব্যও পূরণ কর্‌তে পারিনি। পরজীবনের জন্যও এই অসম্পূর্ণ কর্ম্মের ফল নিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি। সেই দারুণ দুঃখের ভারে—প্রবল অনুতাপেই আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আস্‌ছে। এই দুঃখই ভীষণতম যে, পরলোকের সম্বল, মুক্তির ধন ইষ্টমন্ত্র চিন্তাও যেন বিস্মৃত হচ্ছি। অনেক আশা জীবনে পোষণ করে এসেছিলাম, এখন দেখ্‌ছি, রাবণের ইচ্ছার মতই—সাধু ইচ্ছা, স্বর্গের সিঁড়ি তৈরিই বাকী রৈল। আমার প্রধান কর্ত্তব্য যা, সাধিত না হওয়ায় পিতৃলোকের দারুণ অভিসম্পাত মাথা পেতে নিতে হচ্ছে, আর সেই অভিসম্পাতেই কোন্ অনির্দ্দিষ্ট জ্বালাময় নরকের পথে যেতে বাধ্য হচ্ছি। তা থেকে কি আর উদ্ধারের কোনও উপায় নাই? আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে—আমার এই অন্তিম সময়ে আমার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে মুমূর্ষুর প্রতি দয়াবান্ হয়ে, আমার পরকালের পথের কণ্টক দূর কর্ত্তে পারেন, এমন সাধুহৃদয় মহৎ-প্রাণ কি কেউ নাই? সতীশ! একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ বাবা, যদি

কোনও উপায়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করে একটু শান্তিতে পরপারে পাঠাইতে পার। আগে বুঝ্তে পারিনি যে, জীবন এমনই ক্ষণভঙ্গুর। এ ভুলের সংশোধনের আর কোনও উপায় নাই। যমের সঙ্গে মায়ার শেষ প্রবল যুদ্ধ চলেছে ;—সে যুদ্ধে যমেরই জয়। তাই মৃত্যু—নিয়ম, বিধাতার অখণ্ডনীয় আদেশ—নিয়তি। নিরুপায় হয়েও মায়ার ঘোরে এখনও আমার কন্যা—কন্যাদায় —আমার একমাত্র কন্যা অনূঢ়া,—আমার রমার অনূঢ়া অবস্থা ভেবেই কাতর হচ্ছি ; তোমাদেরই নিকট উদ্ধারের জন্য অন্তিমপথের যাত্রী হয়েও ভিক্ষার্থী হচ্ছি। দেখ বাবা সতীশ, দেখ মা কমলা, তোমরা যদি আমাকে এ দায় হতে মুক্ত কর্ত্তে পার, আমাকে মুক্তি দিতে পার! আমার এই অন্তিম সময়ে —আমার ইহপরকালের পরিবর্ত্তে, আমার জীবনের সাধিত কার্য্য, ধনদৌলতের বিনিময়ে আমার একমাত্র কন্যা রমার ভবিষ্যৎ-চিন্তা হতে আমাকে দায়মুক্ত কর। পরপারের পথের জন্য কেবলমাত্র ইষ্ট স্মরণ করে আমাকে মরতে দাও বাবা।" অশ্রুতে সীতানাথের দুই গণ্ড পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। শরীরের দুর্ব্বলতায়, মানসিক উত্তেজনার পর অবসাদে ও যমের প্রবল তাড়নায় তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া আসিল। সতীশ সেই অন্তিম শয্যাশায়ীকে সেই শেষ মুহূর্ত্তে কি বলিয়া প্রবোধ দিতে পারেন! যাঁহার

আশ্রয়ে লালিত পালিত হইয়া তিনি আজ দশের মধ্যে একজন হইয়াছেন, যাঁহার আশীর্ব্বাদে তাঁহার নিঃস্ব অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন ধনীর অবস্থায় পরিণত হইয়াছে, যাঁহাকে তিনি গুরুর মত ভক্তি করেন, আজ তাঁহারই মৃত্যুসময়ে কি করিলে সেই সকলের প্রত্যুপকার করা হয়, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়াই তিনি পত্নী কমলার দিকে চাহিলেন। কমলা সে দৃষ্টির অর্থে যাহা বুঝিতে পারিল, তাহা জগন্মাতার অংশসম্ভূতা, মহা-প্রকৃতিরূপা, নারীশক্তি নারীমহিমা প্রচারের জন্যই বুঝিতে পারে। অপরে কি তা সম্ভবে? পুরুষ সেখানে নির্ব্বাক্। নারীশক্তি—প্রকৃতি লইয়াই ত পুরুষের মহত্ত্ব-বিকাশ।

এক মুহূর্ত্তে কমলা তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। তখন ত ভাবিবার চিন্তিবার সময় ছিল না। জগদ্ধাত্রী রমণী তখন পরপারের যাত্রীর কাতর-আবেদনে নিজের সুখ-দুঃখের কথা ভুলিয়া গেল; তাহার সুধুই মনে হইল, আত্মবলিদান ব্যতীত আর পন্থা নাই।

কমলা তখন অতি ধীরভাবে বলিল "বাবা, আপনার রমার ব্যবস্থা এখনই করিতেছি।"

মরণোন্মুখ সীতানাথের শরীরে যেন জীবনীশক্তি ক্ষণকালের জন্য ফিরিয়া আসিল; তিনি কমলার দিকে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন "কি করিবে মা? আমার যে আর সময় নেই।"

কমলা বলিল "এখনই বাবা—এখনই।" এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অদূরে তাহার স্বামী সতীশচন্দ্র নির্ব্বাক্ অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল। কমলা তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল "এস।"

"কোথায়?"

"বাবার বিছানার পার্শ্বে একবার চল।" সতীশ কিছুই বুঝিতে পারিল না। কমলা তাহাকে যেখানে লইয়া বসাইল, সে সেইখানেই বসিল। তখন কমলা অতি ধীর, অতি কোমল স্বরে সীতানাথকে বলিল, "বাবা, তোমার জামাই; ইঁহারই হাতে একদিন তোমার কমলাকে দিয়েছিলে—আজ এই হাতেই রমাকে—"

কমলা আর কথা বলিতে পারিল না, কে যেন তাহার গলা চাপিয়া ধরিল।

সীতানাথ অধীরভাবে বলিলেন "কি বল্‌ছ কমলা, আমি যে বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে।"

কমলা তখন রোরুদ্যমানা রমাকে টানিয়া আনিয়া তাহার হাতখানি সীতানাথের হাতের মধ্যে দিয়া বলিল, "বাবা, তোমার সাধের আদরের রমার উপযুক্ত বর আর ত খুঁজিয়া পাই নাই। সকলের চাইতে যিনি উপযুক্ত, তাঁরই হাতে আজ রমাকে দিয়ে যাও।"

সীতানাথ বলিলেন—"আঁ—কমলা—মা—তুই কি বল্‌ছিস্‌?—সতীশ—"

কমলা দৃঢ়স্বরে বলিল—"হাঁ, ইনিই—"

সীতানাথের মুখ ক্ষণেকের জন্য হাস্যোজ্জ্বল হইল; তিনি অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—"তবে তাই হোক্‌।" রমার হাত তখনও তাঁহার হাতের মধ্যেই ছিল। তিনি ডাকিলেন, "বাবা সতীশ!"

সতীশ কাঁদিতে-কাঁদিতে আর একটু অগ্রসর হইয়া বসিল। তখন সীতানাথ রমার হাতখানি সতীশের হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন, "সতীশ, বাবা, রমাকে তোমারই হাতে দিলাম। কমলা, মা, লক্ষ্মী, দেবি, তোকে এতদিন আমি চিন্‌তে পারি নি, তুই ত মানুষ না—তুই—" সীতানাথ আর কথা বলিতে পারিলেন না; তাঁহার অক্ষির তারকা স্থির হইয়া গেল।

ঠিক সেই সময়ে, সেই পল্লীর অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া, গগন-পবন মথিত করিয়া, পথিপার্শ্ব হইতে সেই গ্রামের জগা পাগলা অকস্মাৎ গায়িয়া উঠিল—

"তারা, তুই মা কিসে গড়া।
ও তোরে, কখন দেখি কুসুম-কোমলা
কখন দেখি বড়ই কড়া।"

গৃহ-প্রবেশ

১

"শিবু, এবার বিয়ের সব যোগাড় করি। আর ভাই তোমার কোনও আপত্তিই শুন্‌ব না। বিয়ের কথা যতবার বলেছি, তাতেই ব'লেছ, বি-এ, পাশের পর বিয়ে ক'র্‌বে, ভগবান্ ত আমাদের সে সাধ পূর্ণ করেছেন।"

"বৌদিদি, তোমার কি আর কোন ভাবনা কি চিন্তা নাই? কেবল ঐ এক কথা বিয়ে—বিয়ে—বিয়ে। তুমি আমাকে পাগল কর্‌বে দেখ্‌ছি। এই ত সবে মাত্র আজ পাশের খবর বেরিয়েছে। আগে পাশের পাকা খবরই পাই, তারপর যা হয় হবে।"

"না ভাই, লক্ষীটি, আর অমত করো না! তোমার দাদার বড় সাধ, এই বৈশাখ মাসেই তোমার বিয়ে দেন, আর আমারও তাই ইচ্ছে।"

"দেখ বৌদিদি, বিয়েকে আমি বিশেষ ভয় করি। এমন ভয়ের জিনিস—সংসার-ভাঙ্গার জিনিস, আর দুটো নাই। তাই বড্ড ভয়েই বলি, বিয়ে কর্‌বো না। বিয়ে হলেই এই সব

মানুষই—আর এক মানুষ হয়ে যায়। দেখ না, পাশের বাড়ীর নগেন কত ভাল ছেলে ছিল, বিয়ের পর হইতেই কেমন এক-রকম হয়ে গেল—এক রকম গোল্লায় যেতেই বসেছে। নগেন তার দাদাকে কি ভক্তির চক্ষেই দেখ্‌তো। এখন কি আর বল্‌বো—সব উল্টো। সে তার বৌকে নিয়ে তার কাজের জায়গায় চলে গেছে। এখানকার সংসার পানে আর চেয়েও দেখে না, কোনও খবরও লয় না। আজ তার দাদা তাই দুঃখ করে বল্‌ছিলেন—'পাশ করেছ ভাই, বেশ। খুব ভাল কথা; কিন্তু তোমার এই পাশের ফল যেন আমার ভাইয়ের মত ভাইকে পর না করে। কি আর ব'ল্‌বো ভাই, লেখাপড়া শিখ্‌লেই হয় না। লেখাপড়ার সঙ্গে মনুষ্যত্বও অর্জ্জন কর্‌তে হয়। তা না হলে, তুমি যেমন লেখাপড়া শিখেছ—সে তেমনই শিখেছিল, বুদ্ধিও খুব ভালই ছিল; কিন্তু আমারই অদৃষ্ট-দোষে হয় ত তাকে এমন করে দিলে। তার শিক্ষার উচ্চ গতি চিরদিন লক্ষ্য করে এসেছি, কিন্তু তার হৃদয়ের শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য কর্‌বার বড় একটা সময় পাই নি। তাই বিয়ের পর হতেই, সে তার মনুষ্যত্বটুকু নষ্ট কর্ত্তে বসেছে। কত আশা করে, কত কষ্টে মানুষের মতন করে তুল্‌তে চেয়েছিলাম। মনে কখনও ভাবিনি যে, এমন হবে। এখন দেখ্‌ছি, তাকে ত' মানুষ করিনি, তাকে অধঃপাতের শেষ সীমায় পাঠিয়েছি।' এই সব কথা বলছিলেন।

তাই আমার বড্ড ভয় হয় বৌদি! আমার বিয়ের জন্য তুমি জেদ করো না।"

"তাও কি কখন হয় ভাই? হাতের পাঁচটা আঙুলই সমান নয় যখন, তখন সব মানুষের মন কি এক মাপ-কাটিতে বাঁধা যেতে পারে? আর দেখ ভাই, মাহুত যদি শান্ত, ধীর, উদার হয়, তবে হাতীকেও সে বশ করতে পারে; নিজের মন ঠিক থাক্‌লে, অপরের অতি তুচ্ছ কথায় কি কেউ তার জীবনের উদ্দেশ্য—জীবনের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হতে সরে পড়ে? তোমার সম্বন্ধে আমাদের এখন যা প্রধান কর্ত্তব্য, তা ত আমাদের কর্ত্তেই হবে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে, তোমার বিয়ে দেওয়া। আর দেখ ভাই শিবু,—আমি চিরদিন এই সংসারে একলা—কারও একটু সাহায্য পাবার উপায় নেই,—ছেলেপিলে নিয়ে সংসারের সব কাজ আর পেরে উঠি না। তোমার বিয়ে দিয়ে বৌ আন্‌লে তবু ত একজনের সাহায্য পাব। আর কেন কষ্ট কর্ব্বো ভাই, তোমা হতে আমাদের সব দুঃখই ঘুচ্‌বে, এই আশা বুকে নিয়েই ত সেই তিন বছরের তোমাকে—আজ এত বড় কর্ত্তে পেরেছি, তোমাকে মানুষ করে এসেছি। কত কষ্টের মাঝে পড়ে মা তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। জানি না তাঁহার সেই শেষ আদেশ কতটা রক্ষে কর্ত্তে পেরেছি। সে দুর্দ্দিনের কথা কি আর বল্‌বো বল ভাই।

আজ যদি আমাদের ভাগ্যে মা বেঁচে থাক্‌তেন, তাহ'লে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পার্ত্তেন। তাঁর চির জীবনটাই একটা দুঃখের ঝাঁজে পড়ে, ঝল্‌সে পুড়ে পুড়ে, বের হয়ে গেছে। আমরা তাঁর আশীর্ব্বাদেই এখনও বেঁচে আছি।"

"বৌদিদি, মা যে মরে গেছেন—কষ্টের জ্বালায় যে মরে গেছেন—আমি ত তোমাদের দয়ায় সে সবের কোনও অভাবই বুঝ্‌তে পারিনি। মা কি এর চেয়েও যত্নে—যে আদরে তুমি আমাকে মানুষ কর্চ্ছো এর চেয়েও যত্নে—আমাকে রাখ্‌তেন, না মানুষ কর্ত্তেন? তা আমার বিশ্বাস হয় না। এর বেশী আদর যত্ন মানুষে মনে-মনে আঁক্‌তেও পারে না। তুমি মার বাড়া যত্ন করেছ, আর দাদা, বাবার চেয়েও বেশী স্নেহে আমাকে মানুষ করে তুল্‌ছেন। লোকের মুখে যা শুনি, আর আমার অতি শৈশবের স্মৃতি যতটুকু আমার মনে আসে, তাতে মনে হয়—আমি দেবতার স্নেহ-করুণার মধ্যে থেকে এত বড় হয়েছি। ভগবান যদি দিন দেন,—আর কি বল্‌বো, জীবন দিয়েও যতটুকু পারি সে ঋণ কথঞ্চিৎ শোধ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব।"

২

গ্রামের লোকের অনুরোধে ও গ্রামের জমিদার ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ কাকুতি-মিনতিতে বাধ্য হইয়াই

বুঝি হরিধন মুখোপাধ্যায় নিজের শত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জমিদার মহাশয়ের একমাত্র শিক্ষিতা কন্যার সহিত তাঁহার আজীবনের দুঃখরাশির মধ্যে প্রতিপালিত বি-এ পাশ-করা ভাই শ্রীমান্ শিবধন মুখোপাধ্যায়ের শুভ-বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন। বিবাহের কথা স্থির হইবার পর শিবধন অনেকবার তার বৌদিদিকে বলিয়াছিল, "বৌদিদি তুমি দাদাকে বলে এ বিবাহ বন্ধ করে দাও। বড়লোকের সঙ্গে এমন সম্বন্ধ স্থাপন না করাই ভাল। সমানে-সমানে কুটুম্বিতা না হলে অশেষ কষ্টের কারণ হবে।

শিবধনের একথার উত্তরে তার বৌদিদি বলিয়াছিলেন, "ভাই, কি আর কর্বে বল; আমি অনেক বলে-কয়েও পারিনি। তিনি বলেন, 'জমিদারের কথায় মত না দিলে—বিশেষ এই বিয়ের মত না দিলে, এ গ্রামের বাস ত্যাগ কর্ত্তে হবে।' তিনি যখন কথা দিয়েছেন, তখন তাঁর কথারক্ষার জন্যও, তোমার নিজের দিকে না চেয়েই, তোমাকে এ কাজ কর্ত্তে হবে। আর, বড়মানুষের মেয়ে কি সবাই গর্ব্বিতা হয়? তাদের মধ্যেও কত দেবী আছে।"

শিবধন নিজের দিকে না চাহিয়া, কেবলমাত্র দাদার কথা রক্ষার জন্যই, এই শুভোদ্বাহে স্বীকৃত হইয়া বরবেশে সাজিয়া জমিদার-দুহিতার পাণিগ্রহণের জন্য যে সময় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত

হইতেছিল, সেই সময় চিরপ্রথা অনুযায়ী কনকাঞ্জলি দিবার সময় পূজ্যের নিকট প্রতিশ্রুত হইতে হয় যে, তাঁহাদের সেবার জন্ম দাসী আনিতেই বরবেশে যাত্রা। কিন্তু শিবধন, তার বৌদিদিকে কনকাঞ্জলি দিবার সময় সেই চিরপ্রথার এমন একটা পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল যে, তাহা আজ বঙ্গের প্রায় প্রতি গৃহেই অভি-সম্পাতের মত হইয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। "কোথায় যাচ্ছ ভাই?" শিবধন তার বৌদিদির এই প্রশ্নের উত্তরে যখন অতর্কিতভাবে বলিয়া ফেলিয়াছিল—"বৌদিদি, তোমাদের জন্ম দাসী আন্‌তে নয়—তোমাদেরই জন্ম একটা শাসনদণ্ড আন্‌তে যাচ্ছি—" তখন সকলেই কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল।

ধনীর একমাত্র শিক্ষিতা কন্যাকে দরিদ্রের গৃহে বধূরূপে আনায় হরিধন ও তাহার পত্নী যে আশঙ্কায় বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহাদের সে ভ্রম ও আশঙ্কাটুকু সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্ম নূতনবৌ যেরূপ যথাসাধ্য চেষ্টিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া গ্রামের সকলেই ধন্য-ধন্য করিয়া নূতন বৌর গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছিল।

৩

শিবধন নিজের অধ্যবসায়গুণে ও বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিতে, নিজের প্রাণপাত পরিশ্রমে যেরূপ কর্ম্মপটু হইয়া তাহার দাদার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, তাহার সে চেষ্টা, পরিশ্রম, সর্ব্বসাধারণের আদর্শস্থানীয় হইয়াও স্বার্থান্ধ আধুনিক বিলাসী বাবুদের প্রাণে একটা তীব্র কষাঘাত করিয়াছিল—এ কথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করত। রাণীগঞ্জের একজন সওদাগরের কৃপাভাজন হইয়া শিবধন বিশেষ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছিল। শিবধন পরের কারবারকে নিজের কারবার ভাবিয়া পরিশ্রম করিত;—তাহার সেই পরিশ্রমের ফল ভগবানই তাহাকে হাতে তুলিয়া দিতেছেন বলিয়াই সওদাগরের অল্প মূলধনের কারবার আজ এমন বড় হইয়াছে। শিবধনের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমেই সওদাগরের উন্নতি, এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়াতে সওদাগর নিজের পুত্রাধিক স্নেহযত্নে শিবধনকে প্রতিপালন করেন। শিবধনের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে সওদাগর কারবারের অর্দ্ধেক লাভের একটা অংশ শিবধনকে দিয়াছেন, এবং সংসার-খরচের জন্য প্রতিমাসে তাহার জ্যেষ্ঠের নিকট দুইশত টাকা পাঠাইয়া দেন। হরিধন অতি সামান্য অবস্থায় পড়িয়া পিতৃমাতৃহীন এই কনিষ্ঠ

ভাইটীকে বড় আশা করিয়াই মানুষ করিবার জন্য একটী মুদি-খানায় দিবা রাত্রি পরিশ্রমের বিনিময়ে মাসিক ছয়টাকা বেতনে যে কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা এতদিনে সার্থক হইয়াছে বলিয়া তিনি এখন বড় সুখী। স্বামী-স্ত্রীতে অনেক দিন হইতে বহু অভাবের মধ্যে যে আশা বুকে করিয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয়জ্ঞানে শিবধনকে মানুষ করিয়াছেন—উচ্চশিক্ষা দিয়াছেন, আজ ঈশ্বরের ইচ্ছায় শিবধনের চেষ্টায় সেই আশা পূর্ণ হইয়া হরিধনের চির-আকাঙ্ক্ষিত অতৃপ্ত কামনা-বাসনা পূরণ করিতেছে বলিয়া সে বড় সুখী, বড় নিশ্চিন্ত। শিবধন চারি বৎসর কার্য্য করি-তেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাতেই এখন তাহাদের খুব স্বচ্ছল অবস্থা হইয়াছে—জমিজমাও কিছু হইয়াছে। পিতৃ-পুরুষের দারিদ্র্যের চিহ্ন সেই বহু পুরাতন খড়ো বাড়ীতে থাকিতে ছোট-বৌ—জমিদার-দুহিতা এখন রাজী নহেন। তিনি পিতৃগৃহেই থাকেন। বাড়ীতে কোঠা ঘর হইলেই এ বাটীতে আসিবেন, এই প্রকার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, হরিধন বাড়ীটীকে পাকা করিবার জন্য শিবধনের মত চাহিয়া পত্র দেওয়ায় সে লিখি-য়াছে, "আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা; স্বতন্ত্র ইচ্ছা যেন হৃদয়ে কখনও পোষণ না করি, এমনই আশীর্ব্বাদ করিবেন। কিন্তু আপনি বাড়ী পাকা করিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছেন কেন, তাহা জানিবার জন্য আমি বড় উৎসুক হইয়াছি।"

হরিধন পত্রে অন্য কোন কথা না লিখিয়া এইমাত্র লিখিলেন যে, শিবধন যেন পূজার সময় একবার বাড়ীতে আসে; সেই সময় উভয়ে পরামর্শ করিয়া গৃহনির্ম্মাণের ব্যবস্থা স্থির করা যাইবে।

৪

পূজার সময় শিবধন বাড়ীতে আসিল। তাহার বাড়ীতে পৌঁছিবার দুই-তিনদিন আগে বড়বৌ স্বামীকে বলিলেন, "ঠাকুরপো বাড়ীতে আস্‌ছে; তার আস্‌বার পূর্ব্বেই ছোটবৌকে নিয়ে আসা উচিত। এতদিন না হয় বাপের বাড়ীতেই ছিল; কিন্তু এখন না আনাটা কি ভাল হবে?"

হরিধন বলিলেন, "ভাল নয়, তা জানি; কিন্তু এতকালের মধ্যে ত একদিনের জন্যও তাঁকে এ বাড়ীতে আন্‌তে পারলাম না। পূর্ব্বেও ত শিব দুই তিনবার বাড়ীতে এসেছে, একবারও বৌমাকে আন্‌তে পারি নি। তুমিই নানা রকম ব'লে শিবকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়েছ। তোমার কথা ত সে অমান্য কর্‌তে পারে না; তাই নিতান্ত অনিচ্ছায় যেত; কিন্তু দুইএক দিনের বেশী থাকৃত না।"

বড়বৌ বলিলেন, "সেই জন্যই ত ঠাকুরপো বাড়ীতে আস্‌তে চায় না। এবার তুমি অনেক ক'রে লিখেছ, তাই

আস্‌ছে। তা, ছোটবৌ আসুক না আসুক, তোমার কর্ত্তব্য ত তুমি কর। শেষে এ কথা না হয় যে, আমরা ত আন্‌তে যাই নি।"

হরিধন বলিলেন, "আমি গরিব মানুষ; আমার আর মান-অপমান কি। তুমি বলছ, আচ্ছা আমি বিকেলে একবার যাব।"

কিন্তু যাওয়ামাত্রই জমিদার মহাশয় মেয়েকে ত পাঠাইলেই না। হরিধন কয়েকটি কড়া কথা শুনিয়া বিষণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। শিবধন বাড়ী আসিলে, তিনি এ অপমানের কথা তাহাকে বলিলেন না; পূর্ব্বেও কখন বলেন নাই।

শিবধন বাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া তাহার শ্বশুর তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন; শিবধন গেল না।

পূজার কয়দিন পরে একদিন হরিধন বাড়ীখানি পাকা করিবার কথা শিবধনকে বলিলেন। শিবধন বলিল, "এখন ত বেশী টাকা হাতে নাই; এখন বাড়ী কর্‌তে গেলে ছোটখাট একটা বাড়ীই হতে পার্‌বে! আর কিছুদিন অপেক্ষা কর্‌লে হয় না?"

হরিধন বলিলেন "না, আমার বড় ইচ্ছা বাড়ীখানি পাকা করি, তা ছোটখাট একটা কোঠাই না হয় এখন দেওয়া যাক্; তারপর যা হয়, পরে দেখা যাবে।"

শিবধন বলিল, "বেশ, তাই হবে; কিন্তু আমার একটা কথা আছে।" এই বলিয়া সে চুপ করিল।

হরিধন বলিলেন, "তোমার কি মনের ভাব বল, তাই করা যাবে।"

শিবধন বলিল, "আমার ইচ্ছা এই যে, আমাদের এ বাড়ীর ঘরগুলো ভেঙ্গে ফেলে পাকা বাড়ী না ক'রে, আমরা যে সকল জমি কিনেছি, তারই কোন একটা ভাল জমির উপর নূতন বাড়ী করা হোক। এ বাড়ী যেমন আছে, তেমনই থাকুক।"

হরিধন বলিলেন, "তাতে লাভ কি? এ বাড়ীতে তা হ'লে কে থাকবে?"

শিবধন বলিল, "সে কথা পরে ভাবলেই হবে। এ বাড়ীতে যায়গা ত বেশী নেই, যদি পাকা বাড়ীই কর্‌তে হয়, তা হলে একটু বেশী যায়গা দেখে বাড়ী কর্‌লেই ভাল।"

হরিধন ভালমানুষ; তিনি সোজা যুক্তিটাই বুঝিলেন; বলিলেন, "হাঁ, সে কথা ঠিক; বাড়ীতে যায়গা বড়ই কম। কিন্তু পৈতৃক বাড়ী, এটাকে ত কিছুতেই ছাড়া হয় না। তার কি?"

শিবধন বলিল, "সে কথা পরে ভেবে দেখা যাবে। আমি হাজার তিনেক টাকা নিয়ে এসেছি। এই দিয়ে আপনি বাড়ী আরম্ভ করে দিন; তারপর যখন যেমন দরকার হবে, তা গুছিয়ে দেওয়া যাবে।"

এই কথাবার্ত্তার পর শিবধন যখন বাড়ীর মধ্যে গেল, তখন সে তাঁহার বৌদিদিকে বলিল, "আচ্ছা বৌদিদি, দাদা পাকা বাড়ী কর্‌বার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন ?"

বড়বৌ হাসিয়া বলিলেন, "ব্যস্ত হবেন না ; তুমি এখন দু-পয়সা আন্‌ছ, এখন কি আর আমরা কুঁড়ে ঘরে থাক্‌তে পারি। এখন আমরা কোঠাঘর না হ'লে বাস কর্‌তে পার্‌ব না। আমরা কোঠাঘর কর্‌ব, দশটা ঝি-চাকর রাখ্‌ব, রাঁধুনী বামুন রাখ্‌ব। এসব কর্‌ব না কেন? এতদিন কষ্টেই কাটিয়েছি, এখন তা কর্‌তে যাব কেন ?"

শিবধন বিষন্নমুখে বলিল, "বৌদিদি, তোমার আশীর্ব্বাদে লেখাপড়া ত কিঞ্চিৎ শিখেছি, সব বুঝ্‌তেও পারি। দাদা যে কেন পাকা বাড়ী কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, তা তিনিও জানেন, তুমিও জান ; আমি যে না জানি তা মনে কোরো না। তুমি সত্যি কথা বল কি না, তাই বুঝ্‌বার জন্য কথাটা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম।"

বড়বৌ এখনও হাসিয়া বলিলেন, "ভারি বুদ্ধিমান্ কি না। বল ত তোমার বুদ্ধিতে কি এসেছে।"

"না, সে কথা আর বল্‌ব না" এই বলিয়া শিবধন চলিয়া গেল। তিন-চারিদিন পরেই সে কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল। তাহার বৌদিদির অনেক অনুরোধেও সে এবার কিছুতেই শ্বশুরবাড়ী গেল না। সেখান হইতে কতবার লোক আসিল ; শিবধন গেল না।

৫

দু'দিন যাইতে না যাইতেই গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, শিবধন অন্যস্থানে পাকা বাড়ী করিতেছে। তখন নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল, "তাতে আর কি? শিবু রোজকার কর্‌ছে, সে পৈতৃক বাড়ীতে কোঠা দিয়ে ভাইকে তার ভাগ দিতে যাবে কেন?" যাঁহারা সেকেলে মানুষ, তাঁহারা বলিলেন, "কলি কাল কি না! হরি কত কষ্ট ক'রে ভাইটাকে মানুষ করেছে; আর এখন সে দু'পয়সা আন্‌তে শিখেছে; এখন আর ভাই কে?" কোন শুভানুধ্যায়ী হরিধনকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি শিব পৃথক হয়েই গেল?" হরিধন বলিলেন, "পৃথক হবে কেন? এ বাড়ীতে যায়গা কম, তাই আমরা বাইরে বাড়ী কর্‌ছি।" শুভানুধ্যায়ী বলিল, "তুমি এমনিই সোজা মানুষ বটে। শিবু যা বুঝিয়ে দিয়েছে তাই তুমি বুঝে বসে আছ। আরে ভায়া, মতলবটা কি, তা সবাই জান্‌তে পেরেছে। এ সব জমিদারী চা'ল বুঝেছ ভায়া! এখন তুমি তোমার পথ দেখ; ভাইয়ের মুখ চেয়ে থেক না।"

হরিধন বলিলেন, "আমার ত তা মনে হয় না।" তিন-চারিজন বলিয়া উঠিলেন, "খেটেখুটে বাড়ী তৈরী করে দেও, তারপর তুমিও দেখ্‌তে পাবে, আমরাও দেখ্‌তে পাব। আমরা

ত আর মরছিনে। তখন বল্‌বে, 'হাঁ যা বলেছিলে, তা ঠিক।' এখনও সাবধান হও ; কেন ভূতের বেগার খাটতে যাবে ?" হরিধন বলিলেন, "আমার যা কর্ত্তব্য, তা ত আমি করি। আমার শিবধন তেমন ভাই নয় !"

জমিদার বাড়ীতে যখন কথাটা পৌছিল, তখন সে বাড়ীর সকলেই শিবধনের বুদ্ধি-বিবেচনার প্রশংসা করিতে লাগিল। শিবধনের স্ত্রীই যে শিবধনকে এই সুবুদ্ধি দিয়াছে, সকলেই এই কথা বলিয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। শিবধনের স্ত্রী মনে-মনে বড়ই আনন্দ, বড়ই গর্ব্ব অনুভব করিল।

৬

বাড়ীর অতি নিকটেই তাহাদের একটা জমি ছিল। সেই-খানেই বাড়ী প্রস্তুত আরম্ভ হইল। খুব বড় বাড়ী নহে সাত-আট হাজার টাকার মধ্যে যাহা হয়, সেই রকমের বাড়ী। কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া হরিধন বাড়ী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন ; সারাদিন তাঁহার বিশ্রাম ছিল না। শিবধন, যখন দরকার তখনই টাকা পাঠাইতে লাগিল। বাড়ী প্রস্তুত শেষ হইতে অধিক সময় লাগিল না ; ছয় মাসের মধ্যেই ছোট-খাট একটা পাকাবাড়ী নির্ম্মিত হইয়া গেল। হরিধন শিবধনকে লিখিলেন যে, বৈশাখ মাসের ২৩শে তারিখে শুভদিন আছে ;

সেই দিনেই গৃহ-প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। শিবধনের তাহাতে অমত হইল না; সে এক মাসের বিদায় গ্রহণ করিয়া বৈশাখের প্রথমেই বাড়ী আসিল। এবার আর তাহার স্ত্রীর আসিতে কোন আপত্তি হইল না। যদিও প্রথমে আসিয়া খড়ো বাড়ীতেই উঠিতে হইল; কিন্তু আর কয়েকদিন পরেই নূতন পাকা বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিবে, নিজেই ঘরের গৃহিণী হইবে, এই আনন্দে সে অল্প কয়েকদিন সেই খড়ের বাড়ীতে থাকিতেই স্বীকৃত হইল।

নূতন গৃহে প্রবেশের যথাযোগ্য আয়োজন হইতে লাগিল। শিবধনের ইচ্ছা যে, এই উপলক্ষে একটু ধূমধাম করা হয়; হরিধন আনন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। পুরাতন বাড়ী এবং নূতন বাড়ীর মধ্যে ব্যবধান অধিক ছিল না; রাস্তার এ পাশে পুরাতন বাড়ী, অপর পার্শ্বেই নূতন বাড়ী; সুতরাং দুই বাড়ীতেই আয়োজন চলিতে লাগিল।

শুভদিন সমাগত হইল। যথারীতি হোম-যজ্ঞাদি সুসম্পন্ন হইল। গ্রামের সকলেই উপস্থিত ছিলেন; জমিদার মহাশয়ও আসিয়াছিলেন। যাহাতে কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তাহার জন্য সকলেই কয়েকদিন হইতে পরামর্শ দিতেছিলেন এবং যাঁহার যতটুকু সাধ্য ততটুকু সাহায্যও করিতেছিলেন।

ক্রমে গৃহ-প্রবেশের শুভলগ্ন উপস্থিত হইল। তখন

পুরোহিত মহাশয় শিবধনকে বলিলেন, "তুমি এবং তোমার স্ত্রী নববস্ত্র পরিধান করিয়া প্রস্তুত হও; আর বিলম্ব নাই, গৃহ-প্রবেশ করিতে হইবে।"

শিবধন বলিল, "আমি প্রস্তুত হইব কেন? গৃহ-প্রবেশ করিবেন—দাদা ও বৌদিদি। তাঁহারা থাকিতে আমরা গৃহ-প্রবেশ করিব কেন? তাঁহাদের ডাকিয়া আসুন।"

হরিধন সেইখানেই উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিলেন, "তাতে দোষ কি? তোমরা প্রবেশ করিলেই আমার প্রবেশ করা হইল; তোমরা প্রবেশ কর, দেখিয়া আমি চক্ষু সার্থক করি।"

শিবধন বলিল, "তাহা কিছুতেই হইবে না দাদা! আপনাকে আর বৌদিদিকেই গৃহ-প্রবেশ করিতে হইবে। আপনারা থাকিতে আমি তাহা কিছুতেই পারিব না, তাহা সঙ্গতও নয়।"

বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "তা শিব যে কথা বলিতেছে তাহা সঙ্গতই বটে, জ্যেষ্ঠ উপস্থিত থাকিতে কনিষ্ঠ গৃহ-প্রবেশ করিবে কেন?"

শিবধনের শ্বশুর জমীদারমহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিলেন, "কিন্তু বাড়ী ত শিবধনের; তাহারই গৃহ-প্রবেশ করা উচিত।"

শিবধন মাথা তুলিয়া একবার শ্বশুরের দিকে চাহিল, কিন্তু কোন উত্তর করিল না। পুরোহিত শিবধনকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "তা হলে শিবু, কি করবে বল?"

শিবধন দৃঢ়তার সহিত বলিল, "আমি যা বলেছি, তাই হবে; দাদা আর বৌদিদিকেই গৃহ-প্রবেশ করতে হবে।"

তখন উপস্থিত সকলেই—অবশ্য জমীদার মহাশয় বাদ—শিবধনের কথায় সম্মতি দিলেন। হরিধন কি করিবেন; অগত্যা তিনি গৃহ-প্রবেশে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী বলিয়া বসিলেন, "ছোট-বৌকে না নিয়ে আমি নূতন ঘরে প্রবেশ করব না।"

শিবধন কি করিবে। সে তখন বাড়ীর মধ্যে যাইয়া তাহার বৌদিদির পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বৌদিদি তুমি এতকাল আমার কত অন্যায় আবদারও সয়ে এসেছ; আজ আমার এই শেষ আবদার। এ তোমাকে রক্ষা করতেই হবে, আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না—কিছুতেই না। আমি তোমাকেই আমার মা বলে জানি। এই মাতৃহীন সন্তানের এই আবদারটা আজ তুমি রক্ষা কর, বৌদিদি!" এই বলিয়া সে ঘরের মধ্যে যাইয়া তাহার বাক্স খুলিয়া, তাহার দাদার জন্য একটা গরদের জোড় এবং বৌদিদির জন্য একখানি বহুমূল্য

গরদের সাড়ী বাহির করিয়া আনিয়া, তাহার বৌদিদিকে বলিল "বৌদিদি, এই কাপড়খানা পরে নেও। আমার কথা শোন।"

বড়বৌ আর কি করিবেন, অগত্যা কাপড়খানি পরিধান করিলেন; বলিলেন, "ঠাকুরপো, ছোটবৌকেও সঙ্গে নিয়ে যাই।"

শিবধন বলিল, "বেশ ত।"

একজন লোক দিয়া নূতন বাড়ীতে হরিধনের গরদের জোড় পাঠাইয়া দিয়া শিবধন তাহার বৌদিদি ও স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া নূতন বাড়ীতে গেল; অন্যান্য মহিলারাও তাহাদের অনুগমন করিলেন।

শুভমুহূর্ত্তে যখন হরিধন সস্ত্রীক নূতন গৃহের সোপানে পদার্পণ করিলেন, তখন শিবধন গললগ্নীকৃতবাসে দাদা ও বৌদিদিকে প্রণাম করিয়া বলিল, "বৌদিদি, আমরা তবে আমাদের গৃহে প্রবেশ করিতে যাই।" এই বলিয়া সে একটুও লজ্জা না করিয়া অনতিদূরে দণ্ডায়মানা তাহার স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিল, "চল, আমরা আমাদের গৃহ প্রবেশ করি গিয়ে। এ গৃহ আমাদের নহে, আমাদের নূতন গৃহ-প্রবেশের জন্য রাস্তার ও-পাশের ঐ খড়ো ঘর রহিয়াছে। চল।" এই বলিয়া শিবধন তাহার স্ত্রীর হাত ধরিয়া তাহাদের পুরাতন বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। উপস্থিত সকলে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

অভিসম্পাত

মাতাপিতার স্নেহাবরণের মধ্য হইতে যে দিন স্বেচ্ছায় আমি নির্ব্বাসিত হই;—সেই দিন আমার মনে হইয়াছিল, হয়ত পিতাই আমার উপর অবিচার করিয়া একটা প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছেন, যাহার সংশোধন জীবনের বিনিময়ে হইতে পারে না;—একমাত্র পুত্র আমি,—আমার পিতৃভক্তি হইতে তিনি বঞ্চিত হইতেছেন। সেই ভক্তির অভাবে হয়ত তাঁহাকে একদিন না একদিন ব্যথিত হইয়া—ব্যাকুলচিত্তে আমার অন্বেষণ করিতে হইবে। কিন্তু তখন আমি কোনমতেই বুঝিতে পারি নাই যে, পিতা সন্তানকে কি উদ্দেশ্যে শাসন করেন, পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবন উন্নতির উচ্চমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কত আশায় আশ্বস্ত হইয়া নিজের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুত্রের পৃষ্ঠে যে বেত্রাঘাত করেন, সে বেত্র কাহার শরীরে আঘাত করে?—পুত্রের না পিতার?

মাতাপিতার প্রাণে যে দিন শেষ আঘাত করিয়া—শক্তিশেলে নিক্ষেপ করিয়া, বাড়ী হইতে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া আসি, সেইদিন পিতা রোষে ক্ষোভে মর্ম্মযাতনায় অধীর হইয়া বলিয়াছিলেন; "ভগবান্ করুন, তোমার মঙ্গল হউক,

কিন্তু সময়, আমার একটী স্মৃতি তোমাকে চিরজীবন বহন করিতেই হইবে, তাহা আমার—তোমার পিতৃদত্ত আশীর্ব্বাদের পবিত্র স্মৃতি নহে,—সেইটী আমার প্রাণের জ্বালা—যে জ্বালা সহস্র বৃশ্চিকদংশন হইতেও শতগুণ তীব্র ; তোমারই আচরণ আজ আমাকে যাহা দান করিতেছে,—তাহারই কণামাত্র মর্ম্মবেদনা যেন একদিনের জন্যও তোমাকে ভোগ করিতে হয়।"

বয়সের ধর্ম্মে, মনের অবস্থায়, উচ্চ পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিমানে তখন এই অভিসম্পাতকে মহাগুরুদত্ত মনঃক্ষোভের দারুণ জ্বালার রোষাগ্নি 'অভিসম্পাত' মনে করিতে পারি নাই, বরং আশীর্ব্বাদই মনে করিয়াছিলাম।

যখন আমি সুখ্যাতির সহিত এম্, এ, পাশ করিয়া আমার শিক্ষার শেষ করি, তখন আমার পাশের সংবাদ শুনিয়া দেশের চারিদিক্ হইতে আমার জীবনের বিনিময়ে—আমার উচ্চশিক্ষার বিনিময়ে বিবাহের দোহাই দিয়া বরপণরূপ সমাজের সর্ব্বনাশ যৌতুক আখ্যা লইয়া আমার সম্মুখে লোভের ফাঁদ পাতিতে লাগিল। কত ধনী কত দরিদ্র আমাদের সেই চির দরিদ্রতার আধার পিতৃভবনের ক্ষুদ্র কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। আমার বরবেশের পরিবর্ত্তে, আমার যে কত হাজার টাকা মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে, মনের এই

অদ্ভুত কৌতূহল্ আমাকে এতদূর অপদার্থ করিয়া তুলিয়াছিল যে, আমি মাতাপিতার বুকভরা স্নেহ আবরণী হইতে,—তাঁহাদের অন্তরের আশীর্ব্বাদ হইতে তাহারই জন্ম চিরতরে বঞ্চিত হইয়াছি। আমার কুগ্রহ অভিসম্পাতকেই আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া স্বগর্ব্বে গৃহত্যাগী করাইয়াছিল। পিতার ইচ্ছা আমার বিবাহে আদৌ বরপণ গ্রহণ করিবেন না, বঙ্গসমাজের এই অতি ভয়ানক পাতিত্যের দিনে সমাজের এই কুসংস্কারকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার আদর্শ হইবেন। পুত্রের বিবাহেই এই আদর্শ সমাজকে দেখাইবার আশা তাঁহার অন্তর মধ্যে বহুদিন হইতে প্রচ্ছন্ন ছিল।

'পুত্রের বিবাহে কখনও বরপণ গ্রহণ করিব না এবং যাঁহারা বরপণ গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের সহিত কোনও সম্বন্ধে আমার আত্মীয়গণও আবদ্ধ হইবেন না, কন্যাদান করিবেন না, মাত্র প্রতিজ্ঞার পাশে বদ্ধ করিয়া কোনও কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিয়া পুত্রবধূ গৃহে আনিব', এইরূপই তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল। উপযুক্ত পুত্র আমি, উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও যে পিতার মতের বিরুদ্ধবাদী হইব, তাঁহার সাধু ইচ্ছার মূলোচ্ছেদ করিয়া পাপ বঙ্গ সমাজের পাপের পথ অধিকতর বিস্তৃত করিয়া দিব, তাহা আমারও স্বপ্নের অগোচর ছিল। আমি যে পিতার অবাধ্য হইব, তাহা আমি কখনও মনে কল্পনাও

করি নাই। কি কুক্ষণে জানি না, আমার উপর কুগ্রহের দৃষ্টি পড়িল, যাহার অদৃশ্য শক্তি আমাকে পিতার অবাধ্য করাইয়া তুলিল; ও সেই অবাধ্যতার ফলে, আমি পিতৃমাতৃ স্নেহ হইতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইয়া অর্থের কুহকে পড়িয়া আমার মনুষ্যত্বটুকু বিক্রয় করিয়া এক ধনীর জামাতৃত্বে বৃত হইলাম।

অতি দরিদ্রের সন্তান আমি—এক রাত্রিতে পঞ্চাশহাজার টাকা আয়ের জমিদারী, ধনীর একমাত্র পরমাসুন্দরী কন্যা, যাহাকে বলে 'অর্দ্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকন্যার' আশা কি ত্যাগ করিতে পারি? গৃহ-বিতাড়িত হইয়া মাতাপিতার সহিত আর সাক্ষাৎ করিবার কোনও চেষ্টাই করি নাই। বিবাহের শেষ অনুমতি পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিলাম না।

যথাসময়ে আমার বিবাহ হইয়া গেল। শ্বশুর গৃহই আমার আবাস গৃহে পরিণত হইল। সুখে দুঃখে, সাধে আহ্লাদে বিবাহের পর দিনকতক বেশ কাটিয়া গেল।

হঠাৎ একদিন আমার সুখের স্বরূপ চিত্র সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তৃপ্তি শান্তি আমার হৃদয়ের মধ্য হইতে কোথায় যেন কর্পূরের মত লোপ পাইল। ধনীর সহিত দরিদ্রের, যেমন ব্যবহার হয়,—সমানে সমানে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা স্থাপিত না হইলে যাহা ঘটে, অর্থের কুহকে পড়িয়া রূপজ মোহে আমার মনুষ্যত্ব বিক্রয় করিয়াও যে সেই দশা প্রাপ্ত হইতে পারে,

আমি ত সে আশা হৃদয়ে কোন দিন পোষণ করি নাই! আমার পত্নীর নিকট, তেমন ব্যবহার পাইবার আশা করিয়া ত আমি এ বিবাহে আমার পূজ্যের অপমান করিয়া শ্বশুর গৃহের আশ্রয় লই নাই! স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধের মধ্য হইতে যে এরূপ একটা অদ্ভুত বৈষম্যভাবের সৃষ্টি হইতে পারে, ইহার চিত্র ত কখনও কোন কল্পনায় আঁকিতে পারি নাই। চিরদিনের ধারণা এক দিনেই উল্টাইয়া গেল। আমাদের বিবাহের উপর,—দাম্পত্যপ্রেমের উপর কেমন একটা তীব্র ঘৃণা আসিল। তখন যেন মনে হইল, যদি পরস্পরের পরিচয়ের পর—ভাবী স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পূর্ব্বাপর জানিয়া শুনিয়া বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়; যেমন সব উচ্চ সমাজে, দেশ বিদেশে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিবাহ রীতি আছে, আমাদের দেশেও তেমনি প্রথা থাকিত, তাহা হইলে আমাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এমন একটা ঘৃণার তীব্র কটুভাব কোনও দিনই প্রকাশ পাইত না। কাহাকেও অশান্তির উত্তপ্ত বায়ু স্পর্শ করিয়া জীবনকে দুঃখের শেষ সীমায় লইয়া যাইতে পারিত না। কিন্তু তখনও বুঝিতে পারি নাই, যৌবনের উদ্ধত প্রবৃত্তির মুখে, স্বভাবের চিরাভ্যস্ততার বশে নিজের কর্ত্তৃত্বের অভিমানে, মাতাপিতার অমর্য্যাদা করিয়া স্বেচ্ছায় পত্নী নির্ব্বাচনের শক্তি কাহারও মঙ্গলের হেতু হয় না। শুদ্ধ শাস্ত্রের আদেশ, সমাজের মর্য্যাদা, দেশাচার, সর্ব্বাপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ নরদেবতা মাতাপিতার আদেশে সনাতন রীতি রক্ষার জন্ত যদি বিবাহ করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের এই শুভ পরিণয়ই দাম্পত্যপ্রেমের পূর্ণমূর্ত্তিতে বিরাজ করিত। অর্থের কুহকে পড়িয়া রূপজ-মোহের লালসায় পড়িয়া ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতাই বিবাহের উদ্দেশ্য এই জ্ঞান লইয়া যখন নিজেই নিজের বিবাহ দিয়াছি, নিজেকে অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়াছি; তখন আর সে আশা কোথায়?

২

শ্বশুর শাশুড়ীর স্বর্গারোহণের পর আমার হস্তেই বিষয়ের ভার পড়িল, কিন্তু সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব যাহাকে বলে তাহা আমার উপর আসিয়া পড়ে নাই। বৈষয়িক ব্যাপারেও আমার স্ত্রী আমাকে উপদেশ দেওয়া ও আদেশ করা উচিত মনে করিত। শিক্ষাভিমানী আমি তাহাতে অপমান বোধ করিতাম। ঘটনাচক্রে পড়িয়া আমাকে মফঃস্বলের কোন একটি মহলে যাইতে হয়। সেখানে পানীয় জলের দারুণ অভাব দেখিয়া, নিজে সেই অভাবের মধ্যে দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়া প্রজাদের একান্ত অনুরোধে একটি পানীয় জলের পুষ্করিণী খনন করিতে আদেশ দিই। তাহার সম্যক্ ব্যয় সেই মহলের মুনফা হইতে হইবে। ইহাও কর্ম্মচারীদিগের উপর আদেশ দিলাম। আমার আদেশমত

কার্য্যও হইল। মনের সদা জাগ্রৎ অশান্তির মধ্যেও যেন একটা শান্তির সুশীতল ছায়া আমার বিবাহিত জীবনের পর পাইলাম, যথন এই মাত্র অনুভব করিতেছিলাম ; এমন সময়ে ঐ পুষ্করিণী খননের ব্যাপার ও আমার সহৃদয়তার কথা কে যেন শত ধন্যবাদের সহিত আমার স্ত্রীর নিকট পৌঁছাইয়া দিল।

"প্রজার মঙ্গলের জন্য নিজের এত বড় ব্যাকুল প্রাণে যে একটা 'দিঘী'র নূতন সৃষ্টি করিয়া প্রজাদের উপর জলসত্রের ব্রত উদ্‌যাপন করা হইল, তাহা কি আমাকে একবারও শোনান আবশ্যক মনে করেন নাই ?"

আমার পত্নীর এই ব্যঙ্গোক্তি—মর্ম্মঘাতী ঘৃণার দৃষ্টি আমার মনের ঐ ক্ষীণ শান্তির ছায়াটুকু মুহূর্ত্তে নষ্ট করিয়া নিজের প্রাধান্যরক্ষার জন্য আমাকে তীব্র অপমানের কশাঘাত করিয়া চলিয়া গেল। এই মর্ম্মঘাতী স্মৃতি, বিস্মৃতির অতলস্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই আর একটী ঘটনাস্রোত ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া আমার এই পাতিত্যের শেষ করিবার জন্যই বুঝি আসিয়াছিল। আমাদের স্বামী স্ত্রীর এই ব্যবহারে পরস্পরেই যে ক্রমশঃ অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিতেছিলাম, তাহা তৃতীয় ব্যক্তি কেহই বুঝিতে পারে নাই বলিয়াই মধ্যে মধ্যে আমার উপর দেশের গণ্যমান্য সকলেরই একটি না একটি সৎ উদ্দেশ্য আসিয়া পৌঁছাইত।

দেশের মধ্যে একটিও উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয় ছিল না। সে

অভাবে পড়িয়া ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সকলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাই দেশের মধ্যে যে কোনও স্থানে একটী উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন করিবার অনুরোধ লইয়া চতুষ্পার্শ্বের গণ্যমান্য শিক্ষিতের শ্রেণী আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সাধু ইচ্ছাটি অনেক দিন হইতে আমার হৃদয়েও প্রচ্ছন্ন ছিল। বিদ্যালয় স্থাপনা হইবে, এই প্রকার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াই আমার পত্নীর নিকট একদিন কথা প্রসঙ্গে সমস্ত ঘটনাটি বলিয়া ফেলিলাম। আর একবার হৃদয়ের গোপন ভাবটি জানিয়া লইতে হইবে, এই উদ্দেশ্যেই একথা ব্যক্ত করিতে গিয়াছিলাম। কারণ, আমার হৃদয়ের পূর্ব্ব ক্ষতটি তখনও একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। শেষ পরীক্ষার দিনে আমার পত্নী বিদ্যালয় স্থাপনার কথা শুনিবা মাত্র বলিয়াছিল—

"আমার পিতার সঞ্চিত অর্থ বুঝি এই প্রকারে নষ্ট করিয়া ভবিষ্যতে আমাকে আপনার পূর্ব্ব দারিদ্রের মধ্যে ফেলিয়া আমার উপর আপনার শাসন দণ্ড পরিচালনা করিবার গুপ্ত ইচ্ছা সাধনের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। তাই আজ এই পরামর্শ। আপনার স্বোপার্জ্জিত অর্থের ব্যয় বুঝি কেহ এ প্রকারে করিতে পারে না। পরের বিষয়ের উপর মায়া মমতা বুঝি এই প্রকারই হইয়া থাকে! অর্থ আমার পিতার সঞ্চিত; যাবতীয় সম্পত্তি

এ প্রকারে নষ্ট করিবার ক্ষমতা ত আপনাকে কখনও দিই নাই। অর্থের দানখয়রাতে পরোপকার বৃত্তিতে কখনও বাধা দিয়া কাহারও মনঃক্ষুণ্ণের ভাগী হইবার মন্দবৃত্তি আমার পবিত্র হৃদয়ে পোষণ করি নাই। তাই বলিয়া সৎ ইচ্ছার দোহাই দিয়া এভাবে আমাকে শাসন করিতে আসা যে উচ্চশিক্ষার ফল নহে, তাহা আমি বেশ জানি। স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে মাত্র আমি বাধ্য হইয়া আপনাকে পূজ্য মনে করিতে পারি,—তবে তাহারও তুল্য ব্যবহার পাইবার প্রকৃত ক্ষমতা,—যাহা ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা না পাইলে আমি আমার সেই সৎইচ্ছাকে অপর দিকে লইয়া যাইতেও পারি! আমার উপর আপনারও যে একটী অবশ্য কর্ত্তব্য আছে, তাহা বোধ হয় আপনি কখনই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু সব সময়েই আপনার মনে রাখা উচিত যে, আমার পিতৃদত্ত অর্থের সঙ্গে—যাবতীয় সম্পত্তির সঙ্গে আপনার আমার মধ্যে সে লৌকিক ব্যবহার, সে বাধা বাধকতা নাই। যাহাতে সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় দাসী-স্বভাব আমার হৃদয়ে না আসিতে পারে, এই সাধু ইচ্ছার সার্থকতা করিবার জন্যই আমার পূজনীয় অভিভাবকবৃন্দ আমাকে আপনার ন্যায় উচ্চশিক্ষিত অথচ জন্মনিঃস্বের হস্তে দিয়া গিয়াছেন। আমি দারিদ্র্যের ভীষণ কশাঘাত কখনও সহ্য করি নাই—করিতে পারিবও না বলিয়াই ত আপনার আজীবনের

গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করিয়া আমার পিতা আপনাকে আমার স্বামী নির্ব্বাচন করেন। আপনি আমার স্বামী—স্বামিত্বেই চিরপূজ্য, তাই বলিয়া আপনি ধনীর অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই। আমি যে কখনও আমার মনের চিরস্বাধীন ইচ্ছাকে অপরের ইচ্ছার সহিত মিশাইয়া আমার অস্তিত্বটুকু লোপ করিতে পারিব না তাহা ত আপনার নিজের মনে পূর্ব্বেই অনুমান করা উচিত ছিল। আমি চিরদিন ঐশ্বর্য্যের সুকোমল ক্রোড়ে নিজ ভাগ্যে লালিত পালিত হইয়াছি। আজ কেমন করিয়া স্বেচ্ছায় নিজ ঐশ্বর্য্য পদদলিত করিয়া চিরদারিদ্র্য পোষিত একটা যথেচ্ছাচার মতের সমর্থন করিব, তাহা বুঝিবার শক্তি আমার নাই। আপনি হয়ত আপনার উচ্চশিক্ষার জন্য আমার এই ব্যবহারকে,—আমার শিক্ষার ফলকে,—অধিক কি আমাকেও ঘৃণা করিতে পারেন, করিয়াও আসিতেছেন। তাই বলিয়া আমি আমার ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত অবস্থা বিস্মৃত হই নাই। আপনার উচ্চশিক্ষার মূল্য বুঝি নাই তাহা নহে। অর্থের কুহকে পড়িয়া ঐশ্বর্য্যের বহির্দৃশ্য দেখিয়া নারীর অপরূপ লাবণ্যময়ী রূপে মুগ্ধ হইয়া যে আপনাকে অন্যের দ্বারে প্রায় বিক্রীত করিয়া নিজের পিতামাতার ত্যাজ্যপুত্র হইয়া অভিশপ্তের ন্যায় চির জীবনটা শ্বশুর-গৃহেই কাটাইতে পারে,—তাহাকে আমি কেমন করিয়া আমার ভক্তির অতি পবিত্র আসনে বসাইয়া শ্রদ্ধার চিরপবিত্র আবরণের মধ্যে রাখিতে

পারি, তাহা আমি কথন শিক্ষা করি নাই। আমার বিবাহিত জীবনের পর এই দীর্ঘ সময়ের সুদীর্ঘ চেষ্টায়—যত্নে তাহা শিক্ষা করিতে পারি নাই। কেন বৃথা পরোপকারের দোহাই দিয়া আমার হৃদয় ক্রয় করিবার ইচ্ছা করেন? কোন্ অ-দৃষ্ট ফলে—কোন্ অদৃশ্য কর্ম্মের পাপে আমার নারী জীবনের প্রতি এই অভিসম্পাত হইয়াছে,—তাহা জানিনা। ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়াই —এই দৈব প্রেরিত অভিসম্পাত ভোগ করিয়া—আমার এই নারী জীবনকে নষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছি, নতুবা আমার এমন ভাগ্য হইবে কেন?"

৩

পিতার অভিসম্পাত মূর্ত্তিমান হইয়া আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমার স্ত্রীর সেই দারুণ বাক্যে আমি অস্থির হইয়া কেবল গত কর্ম্মের অনুশোচনায় আমার পাতকস্তের শেষ করিতে ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলাম। এভাবে জীবনে কথনও তাঁহার করুণার কণামাত্র ভিক্ষা করিবার সুযোগ পাই নাই। তাই দয়াময়ের ইচ্ছাপ্রেরিত কর্ম্মস্রোতে পড়িয়া আমার মনের সে অবস্থায় আমারই উদ্ধারের জন্যই বুঝি তিনি কাতরতাপূর্ণ এই সুযোগ দিয়াছিলেন। সেইদিন হইতেই ঘটনা-স্রোতে পড়িয়া আমার অদৃষ্ট আমাকে অন্য পথে লইয়া আসিল,

কর্ম্মক্ষেত্র মধ্যে আমার ভাগ্যচক্র ফিরিয়া পড়িল। আমার জীবনের কুগ্রহ তাহার ভোগের শেষ করিয়া অদৃশ্য হইল। দয়াময়ের কৃপায় আমার উপর সুগ্রহের দৃষ্টি পড়িল। কাল মাহাত্ম্যে আমার উচ্চশিক্ষার ফল উপযুক্ত ক্ষেত্র রোপিত হইয়া আমার আশা ফলবতী হইল। রাজা যে নীতির বশে, যে সনাতন বিশ্ব-প্রকৃতির চিরন্তন নীতিতে একদিন প্রজা হন, প্রজা যে নীতির আশ্রয়ে একদিন রাজা হন, ধনী দরিদ্র হন, দরিদ্র সেই নীতিরই অনন্ত মহিমায় ধনী হন। আমার চিরদরিদ্রতা পূর্ণ অবস্থাও এই নীতিতে পড়িয়া অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে লোকের সুমতি হয়, আমারও তাহাই হইল। যে নর-দেবতার রোষাগ্নি আমি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া তাহাতেই দগ্ধ হইতে বসিয়াছিলাম,—যে দারুণ অভিসম্পাত-স্মৃতি বহনে আদিষ্ট হইয়াছিলাম, সেই নরদেবতার স্নেহাবরণের মধ্যেই আমার চির অধিকার—আমার জন্মগত অধিকার এতদিন শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল; তাঁহাদের দারুণ মনোবেদনার অশ্রুধারায় তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই,—বরং তাঁহাদের কৃপায় ক্ষমায় পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি ক্ষমাপ্রার্থী হইয়াই মাতাপিতার স্নেহ-উৎস মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। এ ক্ষেত্রে পিতা কি সন্তানকে ক্ষমা না করিয়া—আশীর্ব্বাদ-পূত না করিয়া থাকিতে পারেন?

প্রকৃতির অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট বিশ্ব-পুরুষেরও নিত্য পরিবর্ত্তন হইতেছে। সকলেরই অবস্থা নিত্য পরিবর্ত্তনীয়। বিশ্বের অনন্তলীলার মধ্যে প্রকৃতির এই নিত্যনবলীলা মানবের চিত্তকে এমনই অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহার বিচিত্র গতি কাহারও সম্যক্ অবগত হইবার শক্তি নাই বলিলেও দোষাবহ হয় না। আমার স্ত্রীর মানসিক অবস্থাও এই নিত্য পরিবর্ত্তন নীতির মধ্যে পড়িয়া কেন যে অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা যিনি পরিবর্ত্তন করাইয়াছিলেন, বুঝি তিনিই তাহার হিসাব দিতে পারেন, আর দ্বিতীয় কেহ পারে কি? দারুণ রোষে ক্ষোভে মর্ম্মযাতনায় নিজের জীবনের উপর নিজেই সহস্র ধিক্কার দিয়া মৃত্যু দ্বারে যাইতে একান্ত ইচ্ছা করিয়াছিলাম, সে ইচ্ছা পরিবর্ত্তনের কর্ত্তা কে? লাঞ্ছিত হইয়া— পিতৃ অভিসম্পাতে পূর্ণ লাঞ্ছিত হইয়া পত্নী কর্ত্তৃক ধিকৃত জীবন লইয়া যে দিন 'সে মুখ' আর দেখিব না বলিয়া চলিয়া আসি, সেই দিন হইতেই বুঝি, সরমার কর্ম্মগত অনুতাপ শক্তিই তাহার অহংএর অস্তিত্বটুকু লোপ করিয়াছিল। সরমার এখন আর অর্থের প্রতি তত মায়া মমতা নাই। সে এখন অর্থের বিনিময়ে ও নিজের স্ত্রী শক্তিতে স্বামীর পবিত্র স্মৃতি বহন করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত,—বড়ই লালায়িত।

যে স্ত্রী স্বামীর পবিত্র-স্মৃতি বহন করিতে, তাহার প্রাণ

অপেক্ষা প্রিয় পিতৃদত্ত সঞ্চিত অর্থে দেশে অবৈতনিক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় সুবৃহৎ জলাশয় প্রভৃতি সদনুষ্ঠান স্বামীর উদ্দেশ্যে—স্বামীর স্মৃতিটুকু বহনের জন্যই—স্বামীর নামে উৎসর্গ করিতেছে,—সে স্ত্রীর যদি চিরদারিদ্র পোষিত পতি-গৃহদ্বারে আসিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে প্রাণের পূর্ণ আবেগে "স্বামী, দেবতা আমার, নারীদর্প—আমার ধনগর্ব্ব, তোমারই নির্ব্বাক্ অভি-সম্পাতে সব চূর্ণ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা কর"—বলিয়া স্বামী-পাদমূলে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থী হয়, তখন জানিনা কোন্ মানবহৃদয়ে সে ক্ষমা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হয়।

আদর্শ

১

"মা, বড়বাড়ীর মেজদা, বিলাত থেকে ডাক্তারী পাশ করে বাড়ী ফিরে এসেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গেলুম—তিনি সে দেশের কত গল্প বল্‌লেন, ছ'মাস দেশে থেকে, আবার তিনি বিলেতে যাবেন। সে দেশ না কি খুব ভাল—সেখানে না কি ঘড়ির কাঁটার মত সমস্ত মানুষে কাজ করে। সময়ের মূল্য সে দেশের সাধারণ লোকে যা জানে, আমাদের দেশের খুব একজন শিক্ষিত লোকও না কি তাহা জানেন না। সেখানকার ক্ষুদ্র গ্রামখানি পর্য্যন্ত দেখিতে ছবির মত। সেদেশে নিরক্ষর লোক খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। সমস্ত লোকই দিবারাত্রি লেখাপড়ার চর্চ্চা করে। খুব ভাল দেশ, সেখানকার জল-হাওয়াও খুব ভাল। মেজদা' কেমন সুশ্রী হয়ে এসেছেন। কাল তাঁকে নিয়ে আস্‌বো তুমি দেখো। তাঁকে দেখে তুমি বোধ হয় এখন আর চিন্‌তে পার্‌বে না। মা, আমিও বিলাত যাব। মেজদা ছ'মাস পরেই যাবেন, আমিও তাঁর সঙ্গে যাব। তুমি বাবাকে বলে সব ঠিক করে দাও। আমি সেখানে গিয়ে মেজদা'র মত ডাক্তারী পড়্‌বো।"

"না বাবা, তা হবে না, তা হতে পারে না। বড়বাড়ীর কথা ছেড়ে দাও, তারা বিলাত গিয়াছে বটে, কিন্তু তাদের ব্যবহার দেখে মনে হয় তারা সব, না হিন্দু না মুসলমান, তারা ধর্ম্ম-কর্ম্মের কোন ধার ধারে না, গুরুজনদের ভক্তি শ্রদ্ধা করে না। তারা সব স্বেচ্ছাচারীর দল। তারা আপনাদের সুখ দুঃখই বুঝে, পিতামাতার কি পরের সুখ দুঃখের দিকে তারা চেয়ে দেখে না। নিজেদের বাবুয়ানীই তারা খুব ভাল করে শিখেছে। বাপপিতামহেরা যে পথে গেছেন, সে পথে চল্‌তে কেউ শিখেনি। তাই তাদের এখন কেউ মানে না, তাই তারা পূর্ব্বের মত মর্য্যাদা এখন আর কাহারও নিকট পায় না। ওদের ব্যবহার মনে করো না। হিন্দুর আচার ব্যবহার যা তাই আমাদের পালনীয়—রক্ষণীয়—তাই জীবনের আদর্শ করে নিয়ে লেখাপড়া শেখ। দেশের মধ্যে যা যা শেখ্‌বার দেখ্‌বার আছে, যতটুকু জ্ঞান দেশ থেকে হতে পারে, তা যতক্ষণ আয়ত্ত কর্ত্তে না পার, ততক্ষণ ভিন্ন দেশে যাবার কথা মনেও করোনা। মানুষ এই সব কারণেই জীবনের উন্নতি কিসে হয়, অবনতি কিসে হয় বুঝ্‌তে পারে না। যাদের যা ধর্ম্ম, যাদের যা শিক্ষণীয় তার পূর্ণতা না হওয়া পর্য্যন্ত মনকে অচঞ্চল রাখ্‌তে হবে। একথা জীবনে কখনও ভুলো না। কোন্‌টা উন্নতির পথ, মানুষ কি প্রথম জীবনে সেটা নিজে ঠিক কর্ত্তে পারে? সেই জন্যই ত পূর্ব্ব-

পুরুষের আদর্শই জীবনের শিক্ষণীয় ও রক্ষণীয়, এই ধারণা পোষণ করা উচিত। রামায়ণ মহাভারত পড়। তখনকার সঙ্গে এখনকার তুলনা কর। কিসের অভাবে সেই শৌর্য্যবীর্য্য-শালী জ্ঞানময় দেশ এমন অবস্থায় পরিণত হয়েছে, তার অনুসন্ধান কর। তোমরা কৃতিমান্ হয়ে তার অভাব পূরণ কর। বহু পুণ্যে মানুষ এই পবিত্র দেশে জন্মগ্রহণ করে থাকে, মুক্তির দ্বার এই ভারতবর্ষ। তোমরা তার পবিত্র অঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছ—তার উপর তোমাদের যতটুকু কর্ত্তব্য অগ্রে তা পূরণ কর—মানুষের কাজ কর। দেশের কিছুই দেখ্‌লে না, শুন্‌লে না, শিখ্‌লে না। কিন্তু অপরের দেশের সামান্য মাত্র কাল্পনিক ইতিহাস শুনেই, নিজের দেশের সঙ্গে তার তুলনা কর্ত্তে আরম্ভ কর্লে। এতেই আমাদের চরম অবনতি। এই সব মন্দ ধারণা মনে পোষণ করো না। তোমার পিতাকে এসব কথা বলো না। এতে তিনি বিশেষ দুঃখিত হবেন। এই বিপুল সম্পত্তির তুমিই একমাত্র অধিকারী। বংশের একমাত্র রক্ষক তুমি। তোমার উপর আমাদের কত আশা। ছেলেমানুষ, তুমি! তুমি বুঝ্‌বে কি, বাপ মা ছেলের উপর কত আশা করে।”

মাতা পুত্রে এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, পিতা সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুত্রের বিষণ্ণ মুখ—গৃহিণীর

সদাহাস্যময় মুখের পরিবর্ত্তে গাম্ভীর্য্যময় মুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে? অমর কি বলিতেছিলে?"

পুত্র পিতার মুখের দিকে চাহিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। কোনও কথাই বলিতে পারিল না। সে তাহার অপরাধ বুঝিতে পারিয়াই ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিয়াছে, দেখিয়া পুত্রের মাতা বলিলেন,—"পুত্রকে যেমন শিক্ষা দিতেছ, সে তেমনি শিখিতেছে, তাহার দোষ কি? দোষ আমাদের। তাহাকে যেমন আদর্শ দেখাইয়া দিয়াছ, সে তেমনি হইতে চাহিতেছে। বড়বাড়ীর মেজছেলে—কিরণের মত অমরও বিলাতে যাইয়া লেখাপড়া করিবে। তার সঙ্গে দিবারাত্র থেকে ওর ধারণা হয়েছে, সেখানকার সবই ভাল, এখানকার সবই সেখানের তুলনায় খারাপ। সেখানের জল হাওয়ার গুণে বিমলের শরীরও খুব ভাল হয়েছে, ও তাই বিলাত যাবে।" ক্ষোভে আর কিছু বলিতে না পারিয়া মাতা সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

"অমর, বা'র বাড়ীতে চল, আজ আমার শরীর বড়ই খারাপ, তোমাকেই আজ কাঙ্গালী বিদায়, অতিথিশালার বন্দোবস্ত ও আতুরাশ্রমের সেবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। চল, আমিও যতদূর পারি, তোমায় সাহায্য করিব।" এই বলিয়া পিতাপুত্রে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেলেন।

২

শিবসাগরের ঠাকুরবাড়ী খুব বনীয়াদি বংশ। বহুকাল হইতে জমিদারী রক্ষা করিয়া এই প্রাচীন বংশ রাজার তুল্য মান সম্ভ্রম খ্যাতি যশ অর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। শম্ভুনাথ ঠাকুর, নবাবের খাস তরফে কার্য্য করিয়া বিপুল ধন সম্পত্তি করিয়াছিলেন। তিনটী মাত্র পুত্রকে প্রায় ১০ দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তির অধিকারী স্বরূপ রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। শম্ভুনাথ ঠাকুরের মৃত্যু সময়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হরনাথকে নগদ টাকা, মধ্যম পুত্র শিবনাথকে শিবসাগরের সীমানাভুক্ত জমিদারী সম্পত্তি, কনিষ্ঠ পুত্র শঙ্করনাথকে শিবসাগরের বাহিরে মফঃস্বলের জমিদারী সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া পুত্রদিগের বৈষয়িক ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়া যাহাতে মনোমালিন্য না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। হরনাথের বিষয়বুদ্ধি আদৌ ছিল না। ঘোর বিলাসী, পাছে নিজের বাবুয়ানার জন্য, বিলাস চরিতার্থের জন্য প্রজার উপর পীড়ন করে, সেইজন্য শম্ভুনাথ ঠাকুর মহাশয়, তাহাকে কোন দিন জমিদারী দেখিবার ভার দেন নাই। মধ্যম পুত্র শিবনাথের ব্যবহারে বৃদ্ধ ঠাকুর মহাশয় বড়ই প্রীত ছিলেন। শিবনাথের বিষয় বুদ্ধি খুব ভাল ছিল। আত্ম-সম্ভ্রম রক্ষার দিকে তাহার এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল

যে, অনেক সময় তাহার সেই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখখানি দেখিয়া বৃদ্ধ ঠাকুর মহাশয়কেও সাজিয়া গাম্ভীর্য্যভাব ধারণ করিতে হইত। তাই নিজের দেশে নিজের বংশ সম্ভ্রম রক্ষার ভার দিয়া শিবসাগরের যাবতীয় সম্পত্তি শিবনাথকে দিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ শঙ্করনাথের বিষয় বুদ্ধি যথেষ্ট ছিল। কিন্তু পরোপকারই তাহার জীবনের ব্রত ছিল, সে নিজের দিকে চাহিয়া কোনও কাজ করিতে পারিত না। অনেক সময় আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিবারও সঙ্কল্প করিয়া বসিত। কিন্তু ঠাকুরমহাশয় কোনও দিন তাহা করিতে দেন নাই। সেইজন্যই মফঃস্বলের যাবতীয় সম্পত্তি শঙ্করনাথকে দিয়া তাহার পরোপকার ব্রতের সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। হরনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমলকে বিলাতে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য পাঠাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যেদিন অপর দুই ভ্রাতার নিকট মতামত চাহিল। তখন কি শিবনাথ কি শঙ্করনাথ কেহই মত দিলেন না, এই কারণেই তাঁহাদের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় পৃথক্ অন্ন হন। হরনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিলাতেই আছেন, মধ্যম পুত্র বিমলও ডাক্তারী পাশ করিয়া বিলাত হইতে আসিয়াছেন, আরও কিছু দিন সেখানে থাকিয়া কার্য্যতঃ ডাক্তারী শিক্ষা করিতে হইবে বলিয়া আবার বিলাত যাইবেন। শিবনাথের একমাত্র পুত্র অমরনাথ তাহার পিতামহের স্থাপিত অবৈতনিক স্কুলেই প্রথম শ্রেণীতে পড়ে।

শিবনাথ নিজের ছেলের শিক্ষার সঙ্গে অপরের ছেলের শিক্ষা যাহাতে উত্তম হয়, নিজের ছেলের তত্ত্বাবধানের সঙ্গে যাহাতে অপরের ছেলেরও তত্ত্বাবধান করিতে পারেন ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার পথ প্রতিদিন প্রশস্ত হয়, তাহার উপায় করিবার জন্য পিতার স্থাপিত ঐ বিদ্যালয়েই পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাহার কনিষ্ঠ শঙ্করনাথের একমাত্র কন্যা মহামায়া। শঙ্করনাথ নিজের কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্যই গ্রামে একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মহামায়া সেই স্কুলেই পড়ে।

প্রাতঃস্মরণীয় শম্ভুনাথ ঠাকুর মহাশয়, গ্রামের মধ্যে কোনও অভাবই রাখেন নাই। দরিদ্রের সকল অভাব পূরণের দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। নিজের বিষয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সকল অভাব দূর করিতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। আতুরাশ্রম, দাতব্য চিকিৎসালয়, অতিথিশালা, অবৈতনিক বিদ্যালয়, গ্রামের চতুষ্পার্শ্বের রাস্তা ঘাট প্রভৃতিও করিয়া দিয়াছিলেন। একমাত্র বালিকা বিদ্যালয় তিনি করেন নাই। সেটা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কি অন্য কোনও অসুবিধা ছিল বলিয়াই হয় নাই, তাহা কেহ বলিতে পারে না। যাহা হউক মহামায়ার পিতা মহামায়াকে লেখাপড়া শিক্ষা দিবার জন্যই গ্রামের সে অভাব পূরণ করিয়াছিলেন।

৩

পিতা পুত্রে আতুরাশ্রমে আসিয়া রোগীদের পরিচর্য্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শিবনাথ বলিলেন—

"অমর, ঐ রোগীটির শয্যা পরিবর্ত্তন করিয়া দাও। আমি উহাকে কোলের উপর তুলিয়া ধরি। আহা বেচারীর কেহ নাই, চিরজীবন পরের ঘরে খাটিয়া কঠিন পরিশ্রম করিয়া একমাত্র বিধবা কন্যার ভরণপোষণ করিয়া আসিয়াছে। বার্দ্ধক্যে সেবা করিবে, এই আশায় চিরজীবন মনের উৎসাহে পরিশ্রম করিয়া শরীর পাত করিয়াছিল। বিধাতার বিধানে সেই অনাথা বিধবা পিতার সেবাভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই ইহলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। দারুণ মনঃকষ্টে বৃদ্ধের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। অসহায় অবস্থায় পড়িয়া নিজের বাড়ীতেই জীবন বিসর্জ্জন করিতে বসিয়াছিল। দোবে, কাল উহাকে এখানে আনিয়াছে। জ্বরটা খুব বেশী। অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে।"

"বাবা, বিছানা হইয়াছে, এইবার শোওয়াইয়া দিন।"

"অমর, বাবা ঠিক ত হয় নাই, বিছানায় যে অনেক ভাঁজ পড়িয়া রহিল, বেশ পরিষ্কার করিয়া পাতিয়া দাও। যেন উহার গায়ে না লাগে। আহা, বড়ই বৃদ্ধ! শরীর সব নোল হইয়া গিয়াছে।"

"বাবা, ঐ ছেলেটী দেখুন, কত ছট্‌ফট্ কচ্ছে, ওর কি হয়েছে বাবা ?"

"ওর, মা বাপ দুই নাই। ৫ দিনের মধ্যে দুই হারিয়েছে। ভদ্র ঘরের ছেলে। আত্মীয়ের নিকট যেতে রাজি হয়নি; ৪ চার দিন উপবাস দিয়েছিল, তবুও কারও দ্বারস্থ হয়নি। জ্বর হয়েছে, নিজেই এখানে এসে আমার কাছে আশ্রয় চায়। জ্বর ভাল হলে ওর লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ও তোমাদের স্কুলেই থাক্‌বে, থাবে-দাবে পড়্‌বে। ছেলেটীকে দেখে মনে হয় যেন খুব মনে তেজ পোরা আছে। থারমোমিটার দিয়ে দেখত, ওর এখন জ্বর কত ?"

"ও! খুব জ্বর। ১০৪ জ্বর।"

"কালকার চেয়ে কিছু কম, কাল ১০৫ জ্বর ছিল।"

"যাও ত বাবা, একবার ডাক্তারকে ডাক ত। তিনি বাগানের পাশের ঐ নূতন বাড়ীতে আছেন,—যে বাড়ীতে, তোমাদের ব্যায়াম হ'ত। যাও বাবা, শীঘ্র শীঘ্র ডাক, ওর আগে ওষুধটা এখনই বদলান দরকার মনে হচ্ছে, বড় দুর্ব্বল হয়েছে।"

ডাক্তার আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া পিতাপুত্রে প্রায় পঞ্চাশ জন রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তত্ত্বাবধায়কদিগকে

প্রত্যেক রোগীটীর সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দিয়া দ্বিপ্রহরে বাড়ী ফিরিলেন।

আহারাদির পর আবার রোগীর সংবাদ লইয়া সদর কাছারী বাড়ী গিয়া অমরনাথকে প্রজার উপর জমিদারের কি প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহার শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দিনান্তেও অবসর ছিল না। সন্ধ্যার সময় শঙ্করনাথের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সংসারের যাবতীয় কর্ম্মের বন্দোবস্ত ও খোঁজ খবর লইয়া মহামায়ার মুখে এক অধ্যায় রামায়ণ শুনিয়া তবে বাড়ী ফিরিলেন। শঙ্করনাথ বিদেশেই বেশী সময় থাকিতেন। তাঁহার মফঃস্বলেই সব জমিদারী। সেই কারণ, তাঁহার শিবসাগরে বেশী দিন থাকা হইত না। শিবনাথের উপরই সংসারের সমস্ত ভার ছিল।

৪

অমর যেদিন বিলাত যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে সেইদিন হইতেই, পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের জন্য পিতা-মাতার দৃষ্টি পড়িল। শিবনাথ সর্ব্বদা তাহাকে সঙ্গে রাখিয়া নিজের কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। পিতার অবর্ত্তমানে যে তাহাকেই এই সব বজায় রাখিতে হইবে, তাহাও তাহাকে বুঝাইয়া দিতে ভুলেন নাই। সেই সব কর্ম্মে যাহাতে অমরের

আনন্দ হয়, যাহাতে তাহার আসক্তি জন্মে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অমর যাহাতে সানন্দে তাহার পিতৃ-পিতামহের কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া, সেই বংশের সম্ভ্রম বজায় রাখিতে পারে, তাহারই মত দিবারাত্রি শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে বৃথা যায় না। পিতা-মাতার শিক্ষায় সন্তান যতটা শিক্ষিত হইতে পারে, অপরের নিকট ততটা হইবার কোন আশাই করা যায় না। বিমলের সহিত অমরের আর সাক্ষাৎ হয় নাই। শিবনাথ দুমাসের মধ্যে আর কিরণের সঙ্গে অমরের দেখা সাক্ষাৎ করিবার কোন সুযোগ দেন নাই। বিলাত যাওয়ার ২।৪ দিন পূর্ব্বে অমরের সহিত শেষ বিদায় লইতে আসিয়া জানিল, তাহার পিতৃব্য ও অমর অতুরাশ্রমে আছেন। বিমল আতুরাশ্রমে আসিয়া দেখিল, অমর নিজের হাতে সব রোগীদের পরিচর্য্যা করিতেছে, আর তাহার খুড়ামহাশয়, ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রত্যেক রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য তত্ত্বাবধায়কদিগকে উপদেশ দিতেছেন, কোথাও বা নিজের হাতে তাহাদের ঔষধ খাওয়াইয়া দিতেছেন। বিমল ডাক্তারী পাশ করিয়াছে। বিলাতে খুব ভাল করিয়াই ডাক্তারী পড়িয়া পাশ করিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই শিবনাথ পরমানন্দে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "দেখত বাবা বিমল, আতুরাশ্রমের রোগীদের একবার।

তুমি ত অনেক দেশ বিদেশ ঘুরিয়া অনেকটা বহুদর্শী হইয়াছ। কি প্রকার ব্যবস্থা করিলে আমার এই অনাথ আতুরদের কোনও কষ্ট না হয়, সহজেই আরোগ্য হইতে পারে; সে দেশেও কি, এই প্রকার অনাথের দল আছে, সেখানেও কি তাদের এই ভাবে সেবা করা হয়? দেখত বাবা, সব ঠিক হইতেছে কি না।"

"কাকাবাবু, এ আশ্রম না হাঁসপাতাল?"

বিমলের পার্শ্বেই এক অশীতিপর বৃদ্ধ আতুর শয্যার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া ছিল। শিবনাথের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিল—"যে কাকামহাশয়ের কথায় সভ্যতা হিসাবে কাকাবাবু বলিতে পারে, তাহার পক্ষে এ অনাথাশ্রম নয়, আতুরাশ্রম নয়—হাঁসপাতালই বটেগো মহাশয়।"

"জনার্দ্দন, কিরণ আমার দাদার মেজছেলে,—তোমাদের দেখ্‌বার জন্ত এসেছে, উৎসাহ দাও, উপদেশ দাও—আর বল, কি প্রকার ব্যবস্থা হলে তোমাদের সুবিধা হবে। কোনও কষ্ট হবে না। ওরা কৃতিমান্ হয়ে, দেশে বস্‌লে সব অভাব দূর হবে। ওরাই ত ভবিষ্যতে এই সব রক্ষা কর্‌বে।"

জনার্দ্দন আক্ষেপের স্বরে বলিতে লাগিল—"তা পার্‌লে পার্‌তো, কিন্তু তার আর আশা কই? ঐ দেখুন না স্বাভাবিক কোমলতাপূর্ণ মুখখানিকে, কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে

কেমন বিকৃত করে তুলেছে! ওঁরা কি ঐ দেবপ্রতিমার —অমরের মত, আপনার মত, নিজেদের অবস্থা ভুলে পরোপকারের জন্য প্রাণপণ যত্ন নিয়ে রোগীর সেবা কর্ত্তে পার্ব্বে! আত্মমর্য্যাদা কোন্ দিক দিয়ে বাড়ে তা কি ওরা ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌বে। প্রীতির চক্ষে—স্নেহের বন্ধনে ঔদার্য্য গুণের মহিমায় মানুষের কাছে মানুষ কতটা ভক্তি আদায় কর্ত্তে পারে, তা ত ওদের কেউ শেখায় নি। ওদের যে আজীবন শিক্ষা হচ্ছে;—বলপূর্ব্বক সব আদায় করা, কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের উপর মুখখানি ভার করে আদব কায়দার সভ্যতার সহিত মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করা। তা না হলে ভাল ডাক্তার হয়ে এসেছেন উনি। আর এই ওঁরই পিতামহের স্থাপিত অক্ষয় কীর্ত্তি আতুরের সেবাশ্রম দেখ্‌বার সময় হয়ে উঠেনি। দশের ও দেশের উপকার ত পরের কথা, আত্মজীবনেরই সহস্র ত্রুটিতেই নিজের জীবন পূর্ণ কর্‌তে কর্‌তে একটী পূর্ণ অপরাধীতে পরিণত হয়। সে অপরাধ প্রথম জীবনে মানুষে বুঝ্‌তে পারে না। যৌবনের উদ্ধত ভাব আর পাশ্চাত্য শিক্ষা এই দুটো একসঙ্গে মিশে,—একটা স্রোতের সৃষ্টি করে, মায়া মমতাহীন আচারহীন আত্মমর্য্যাদাহীন স্বেচ্ছাচারিতায় পূর্ণ কোন এক অজ্ঞাত দেশের উপর দিয়ে বিলাসিতার সমুদ্রের মাঝখানে ফেলে এখনকার বালকদিগের ও ছাত্রদিগের শিক্ষার

জীবন নষ্ট করে দেয়, তাদের অজ্ঞাতে তাদের জীবনকে দেবত্বের পরিবর্ত্তে পশুত্বে পরিণত করে।

"এই দেখুন না, আজ আমাকে অতুরাশ্রমে যে আশ্রয় ভিক্ষা কর্ত্তে বাধ্য করেছে, তাও এই প্রকার শিক্ষার ফলে। আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত আমার দুই জন কৃতিমান্ ছেলে—উপায়ী ছেলে—আমার মুখ চাইবার সময় পেলে না—অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ পিতা আমি—আমার সেবাশুশ্রূষা কর্‌তে তাহাদের মতি গতি হল না, উপায়ের অছিলায়, অর্থের কুহকে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর্ত্তে পার্লে না; তাই এই বৃদ্ধ পিতাকে ফেলে রেখে সপরিবারে বিদেশে চলে গেছে। আজীবন না খেয়ে না পরে তাদের যে মানুষ করেছি, তার পরিণাম ত এই। বর্ত্তমান জীবনে ত তাদের হতে—পুত্র হতে পিতার এই দশা। পরজীবনেও আরও ভয়ানক;—পিণ্ড প্রত্যাশাও পাপ।"

আতুরাশ্রমের বৃদ্ধ জনার্দ্দনের মুখে সেই সব কথা শুনিয়া বিমল বিশেষ ক্ষুব্ধ চিত্তেই পিতৃব্যের কথামত একবার আতুরাশ্রম পরিদর্শন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। মনের মধ্যে তাহার প্রবল তুফান উঠিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ মনে মনে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিল যে, বোধ হয় তাহাকে অপমানিত করিবার জন্যই তাহার খুড়া-মহাশয় ঐ বৃদ্ধকে এই ভাবে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। যাহা

হউক, এই সব কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিতেই হইবে। অপমানিত হইয়াছি, হয়ত আরও অনেকবার অধিকতর অপমানিত হইতে হইবে, তাই বলিয়া নিজের আদর্শ জীবন গঠনে অধ্যবসায় হীন হইয়া ঐ বর্ব্বরতাময় কুসংস্কারাপন্ন ইতর শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়া অতি প্রাচীন ভাবাপন্ন হইব না। যে ভাবে যে শিক্ষায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, তাহার শেষ না করিয়া, তাহার সম্যক্ আয়ত্ত না করিয়া অন্যদিকে মন দিব না। অমর অনেকের স্তুতিবাদকে আশীর্ব্বাদ মনে করিতে পারে, সেটা তাহার অল্পবুদ্ধির পরিচয়। আমার এই উচ্চশিক্ষা, বিলাত ভ্রমণের বহুদর্শিতা, বহু উন্নত বিজ্ঞানের আলোচনায় যে জ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছি সে জ্ঞানের সীমা উহারা বুঝিবে কি? কিন্তু এই সব লোকের—এই সব অশিক্ষিতের কুসংস্কারাপন্ন অল্পবুদ্ধির মধ্যে আমাদেরই বা কতটা উন্নতি হইবে। এ প্রকার দেশে এই সব লোকের মধ্যে বাস করিলে বরং আমাদের বর্ব্বরতার ও অসভ্যতার পরিচয় দেওয়া হইবে।

এই কুসংস্কারাপন্ন দেশে অশিক্ষিতের মধ্যে বাস করিলে বন্ধুবান্ধবের নিকট মুখ দেখান ভার হইবে। দাদার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বাবাকে বলিয়া কোনও বিশিষ্ট শিক্ষিত এবং সমৃদ্ধিশালী মহানগরীতেই বাস করিতে হইবে। সেই-

খানেই আমাদের কার্য্যক্ষেত্র করিয়া উন্নত জীবনকে আরও উন্নতির পথে লইয়া যাইব। এ পল্লীগৃহে বাস করিতে আসিয়া আর যাচিয়া নিজেদের অপমানের বোঝা শিরে বহন করিবে না।

৫

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এই যে মহাবাক্য বিশ্বের ভিতর অহরহঃ আপনার প্রভাব দেখাইয়া বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিতেছে, ইহার অন্যথা কোনও দিন হয় নাই।

বিমল নিজের ধারণামত পরামর্শে জ্যেষ্ঠর সহিত বিলাতেই বাস করিবে বলিয়া, পিতাকে পত্র দিয়াছে। দুই ভ্রাতায় এক পত্রে পিতাকে জ্ঞাপন করাইয়াছে;—"মাই ডিয়ার ফাদার আমাদের এই উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত-জীবন—যে শিক্ষা আমরা জীবনপণ করিয়া এই সুদূর প্রবাসে আসিয়া কঠোর পরিশ্রমে আয়ত্ত করিয়াছি এবং নিজেদের প্রতিভাবলে কৃতকার্য্য হইয়াছি সেই শিক্ষার—সেই জ্ঞানের অবমাননা করিবার জন্য আমরা আর কুসংস্কারাপন্ন সভ্যতাহীন, শিক্ষাহীন, বর্ব্বরতার জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাইব না। জ্ঞানের অপূর্ব্ব মহিমা দেখাইবার জন্যই, কর্ত্তব্যকে অক্ষুন্ন রাখিব বলিয়াই এই বাণী-মন্দির ত্যাগ করিয়া এ জীবনে আর অন্যত্র যাইব না। ইহাতে আমাদের জীবনে

কোনও ত্রুটী হইবে না, কর্ত্তব্যের উপর তাচ্ছিল্য প্রকাশ হইবে না বলিয়াই মনে করি। আমাদিগকে পরম যত্নে আজীবন প্রতিপালিত করার জন্য—বিশেষতঃ মাতৃহারা আমাদিগকে একা আপনি পিতৃমাতৃ, দুই স্নেহদানেই বর্দ্ধিত করিয়া আমাদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াছেন ; বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নিজের কর্ত্তব্য চিরতরে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন বলিয়াই, আমরা আপনার নিকট অশেষ ঋণী ; সেই ঋণ পরিশোধ করিতে আমরা অক্ষম। সে ঋণ পরিশোধ না করিলে আমরা এই জগতে ঋণী থাকিয়া যাইব বলিয়া আমাদের মৃত্যুর পরে আমাদের আজীবনের সাধু কর্ম্মের বিচারের সময় এই ঋণের জন্য হয়ত চির-অন্ধকারময় কারায় আবদ্ধ হইবার আদেশ হইবে। আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের সুবিচার হইবে না বলিয়াই তাহা শোধ করিতেছি। সেই জন্যই আমরা দুই ভ্রাতায় মিলিয়া এই লক্ষ-টাকা পত্রের সহিত পাঠাইয়া ঋণ পরিশোধ প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, আপনি সন্তোষের সহিত ইহা গ্রহণ করিয়া আমাদের অঋণী করিবেন। একথা বলাও হয়ত দোষের হইবে না যে, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেদের শক্তির উপর আমরা অধিকতর ধনশালী, গণ্যমান্য ব্যক্তি হইতে পারি বা ভাগ্যগুণে অতি দরিদ্র—সাধারণের হেয়ও হইতে পারি ; সে উন্নতি অবনতির সহিত জগতে আর কাহারও কোনও

সম্বন্ধ আছে একথা যেন কেহ না ভাবেন—ইহাই আমাদের শেষ প্রার্থনা। নিজ ঔদার্য্যগুণে আমাদের আজীবনের ত্রুটির মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—তোমার স্নেহাকাঙ্ক্ষী

অমল, বিমল।"

৬

যেদিন এই পত্র আসিয়া হরনাথের হাস্যময় মুখখানিকে বিষাদের আবরণে চিরতরে আবৃত করিল, সেইদিন সন্ধ্যার সময় ছাদের উপর বসিয়া শিবনাথ শঙ্করনাথের সহিত কতকগুলি বৈষয়িক পরামর্শ করিতেছিলেন। তাঁহারা তখনও জানেন না যে তাঁহাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুত্রগণ বিলাত হইতে লক্ষ টাকার বিনিময়ে পিতৃঋণ হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়া ও পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ চিরতরে পৃথক্ করিতে—এই অবিনাশী সম্বন্ধ জন্মের মত নাশ করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাদের পত্র দিয়াছে।

সেদিনের পরামর্শের প্রধান লক্ষ্য বস্তু, মহামায়ার বিবাহের সময় উপস্থিত,—দিনধার্য্য হইয়া গিয়াছে। বিবাহের সময় তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ হরনাথকে নিমন্ত্রণ করা হইবে কি না, বিবাহের পূর্ব্বে অনুমতি লইতে যাইবেন কি না। হরনাথ নিজের ছেলেদের বিলাত পাঠাইয়াছেন, ছেলেরাও মধ্যে বাড়ী ফিরিয়া-

ছিল। হিন্দুর আচার ব্যবহারের বিপরীত আচরণ করা যতদূর সম্ভব, প্রকৃত ইংরাজেও যে আচরণে কুণ্ঠিত হয়েন, তাঁহাদের সভ্যতা-জ্ঞানের সীমায় যাহা সদাচার নয় বলিয়াই মনে করেন, এই নূতন বিলাত-প্রত্যাগত হিন্দুর সন্তান, তাহাদের শিক্ষার চরম সীমা দেখাইবার জন্য ও হিন্দুর আচার ব্যবহার যে তাহাদের ধারণায় কুসংস্কারাপন্ন ইহা সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইবার জন্যই, যে ব্যবহারে য অনাচার করিয়াছিল, তাহাতে হরনাথ সমাজের আবর্জ্জনা রাশির মত এক পার্শ্বেই পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অপর সাধারণকে যে নিজেই পতিতবোধে পৃথক করিয়া দিয়াছেন, এই ভাবই দেখাইতেন। গ্রামে সেইজন্য দুইটা দল হইয়াছিল। কিন্তু কোন্ পক্ষের লোক যে সমাজের নিকট প্রকৃত অপরাধী তাহার মীমাংসা এতদিন হয় নাই। হরনাথের এই বদ্ধ ধারণা ছিল যে আপামর সাধারণ সকলেই কুসংস্কারে আবদ্ধ, তাই উচ্চাশিক্ষার জন্য পুত্রদিগকে বিলাত পাঠাইতে সাহস করে না। দারিদ্র্যের অবস্থায় তাহাদের শক্তিতে কুলাইয়া উঠে না। হিংসা দ্বেষে জর্জ্জরিত এই দেশের লোক যাহার ক্ষমতা আছে, তাহাকেও সৎকার্য্য করিতে এই প্রকারে বাধা দেয়।

অল্পবয়স্ক যুবকের দল অভিভাবকহীন অবস্থায় সুদূর সমুদ্র পারে যাইয়া বিদ্যার পরিবর্ত্তে অবিদ্যা শিক্ষা করে, সংযম-

তার পরিবর্ত্তে বিলাসিতা আয়ত্ত করে, হিন্দুর আচারের পরিবর্ত্তে ম্লেচ্ছাচারী হয়, তাহাদের অপরিণামদর্শী ক্ষুদ্র মানসিক বৃত্তি সব পুণ্যের পরিবর্ত্তে পাপের আপাতমধুর পথে বিচরণ করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করে—এ কথা হরনাথ একদিনও ভাবিয়া দেখেন নাই বলিয়াই, নিজেকে অপরাধী স্বীকার করেন নাই। নিজের দাম্ভিকতায় তিনি সাধারণকেই অপরাধী স্থির করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার সে ভ্রম গিয়াছে। আজীবন যাঁহাদের শত্রু ভাবিয়াছিলেন, তাঁহারা যে চিরদিন তাঁহারই ভবিষ্যৎ বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া সৎপরামর্শ দিয়া প্রকৃত মিত্রের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, আজ তিনি সে কথা বুঝিতে পারিয়াছেন। আজ আত্মগ্লানিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ তিনি বিশ্বের নিকটে অপরাধ স্বীকার করিতে প্রস্তুত। আজ তিনি জ্ঞানকৃত নিজ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজের প্রাচীন রীতি নীতির উপর যে দৃঢ়তা আছে—সেই দৃঢ়তা রক্ষা করিতেও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, —একথা শিবনাথ কি শঙ্করনাথ এখনও জানেন নাই। তাই জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য মর্য্যাদা—কনিষ্ঠের উচিত কার্য্য—সমাজের সামাজিকতা এই সব অবশ্য অনুষ্ঠের কর্ম্ম কি উপায়ে রক্ষা করিতে পারিবেন, তাহার পরামর্শ করিতেছিলেন।

৭

অমর মহামায়াকে সঙ্গে লইয়া সেদিন সন্ধ্যার সময় আতুরাশ্রমে গিয়া কোন্ রোগীর কি প্রকার অবস্থা—কাহার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল হইয়াছে, কে কত দিন আছে, কাহাকে আরও কতদিন থাকিতে হইবে; আরোগ্যের পর কাহাকে কোন্ কোন্ কার্য্যের ভার দেওয়া যাইবে, এই সব আলোচনায় নিযুক্ত ছিল। ডাক্তার মহাশয় শিবসাগরেই কাহাদের বাড়ীতে রোগী দেখিতে গিয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই। রোগীর অবস্থা বড়ই সাংঘাতিক বলিয়া অপর ডাক্তারে পরামর্শের জন্ম তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে। দুই একটি নবাগত রোগী যাহারা ডাক্তার মহাশয়ের বাহিরে যাইবার পরেই আসিয়াছে, তাহাদের এখনও কোন প্রকার ব্যবস্থা হয় নাই। তাহাদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই অমর ও মহামায়া বাড়ী ফিরিবে বলিয়া, ডাক্তার মহাশয়ের অপেক্ষা করিতেছিল। এদিকে পুত্র কন্তার অধিক বিলম্ব দেখিয়া শিবনাথ ও শঙ্করনাথ আতুরাশ্রমে আসিলেন। তাঁহারাও ডাক্তারের আগমনের প্রতীক্ষায় রহিলেন। ডাক্তার মহাশয় শশব্যস্তে ফিরিয়া আসিয়াই বলিলেন, "আমি আপনাদের বাড়ী হয়েই আস্‌ছি। এখানে এখন আস্‌বেন আমি তা ভাবিনি। বড়বাড়ীর বড়-

বাবুর হঠাৎ হৃদ্‌কম্প হয়ে মূর্চ্ছার মত হয়েছিল; এখন তাঁর অবস্থা ভাল নয়। তাঁকে খুব সাবধানে রাখ্‌তে হবে, আবার তাঁর মূর্চ্ছা হতে পারে। কিন্তু বড়বাড়ীতে তাঁর সেবা করে এমন লোক নাই। সকলেই যেন 'হামবড়া'। শুশ্রূষার কাজ তাদের হতে ঠিক হয় না, তারা কেউ সে কাজ কখনও করেনি, জানে না। এখন কি উপায় করা উচিত, আপনারা ঠিক করুন, সেটা আপনাদেরই কর্ত্তব্য। আমি আর বেশী কি বল্‌বো। যদি আপনাদের দুই ভাইয়েরই যাবার কোনও বাধা থাকে, তবে আমার শিষ্যদের আমিই আদেশ দিই। অমর আর মহামায়া আজ সেখানে গিয়ে তাঁর সেবা করুক।" এই কথা শুনিয়াই শিবনাথ বলিলেন, "সে কি ডাক্তার মহাশয়, আমাদের জ্যেষ্ঠের অসুখ, আমরা যাব না কি? আমরাই ত তাঁর সেবক—আমরাই ত তাঁর সেবা কর্‌বো, আমরা সকলেই যাবো, প্রাণ দিয়ে তাঁর সেবা করে, তাঁকে সেবার অভাব জান্‌তেই দেব না। বিশেষ অমল ও বিমল বিদেশে। এ ক্ষেত্রে কি মনোমালিন্যের কথা মনে আন্‌তে আছে। ব্যক্তি-গত বিবাদ ত আমাদের নেই। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে গোল-যোগ, তা হয়েই থাকে। তাই ব'লে কি ভাই কখন পর হয়?"

মহাত্মারা চিরদিনই তাহার জ্যেষ্ঠতাতের নিকট আদর

পাইয়া আসিয়াছে। আজ তাঁহার অসুখের সংবাদে অতি কাতর হইয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল—"জেঠামহাশয় ঠিক বলেছেন,—আর্ত্তের সেবায় বিবাদ কি? পীড়িতের শুশ্রূষায় আবার মনোমালিন্য কি?"

"এই ত আমাদের মায়ের আদেশ। মহামায়া চল মা, তোমার সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে, তোমার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে—তোমার পুত্রের সেবা কর্ত্তে। মা যে তুমি, তোমার সব সন্তানই সমান। এমন প্রাণ না হলে, এমন স্নেহ, দয়া, মায়া না থাক্‌লে কি এরা মা হ'তে পারে। ডাক্তারমহাশয়, নবাগত রোগীদের ব্যবস্থা করে, এখানকার সব বন্দোবস্ত করে, আপনাকেও আবার সেখানে যেতে হবে। আমরা সকলেই যাচ্ছি—আপনিও আসুন।" সেই মুহূর্ত্তে শিবনাথ তাহার জ্যেষ্ঠের সেবার জন্য সকলকে লইয়া বড়বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। ভ্রাতৃবিরোধের পর হইতে এ বাড়ীতে আর কেহই আসেন নাই। পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিন ভ্রাতায় আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। জ্ঞাতিত্বের বিবাদ এই প্রকারই হইয়া থাকে। যেখানে যত নিকট সম্বন্ধ—সেইখানেই তত বেশী জ্ঞাতিত্বের প্রভাব।

৮

শব্দভেদী বাণের মত কার্য্য করিয়া হরনাথের পুত্রদিগের পত্র তাঁহার হৃদয়কে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বড় অধিক আঘাত করিয়াছে। আজীবনের ধারণা মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহার মানসিক দৌর্ব্বল্য এত প্রবল হইয়াছিল যে, তাহা তাঁহার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হরনাথকে দেখিয়া এখন আর সেই তেজস্বী—দাম্ভিক—বিলাসী মনে হয় না। একদিনে একটা ঘটনাতেই যেন তাঁহার শরীর বার্দ্ধক্যের দিকে অগ্রসর হইতে অতি দ্রুতপদে চলিয়াছে। কি কারণে তাঁহার মন আজ এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, আর কি নিমিত্তই বা তাহার মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা হইতেছে, তাহা কাহাকেও বলেন নাই। পরমুখাপেক্ষী হওয়া তাঁহার মতের বিরুদ্ধ—পরমুখাপেক্ষীর জীবনকে তিনি ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন, আজ এই দারুণ বিপদের সময় তিনি কাহার শরণাপন্ন হইবেন, কাহার গলগ্রহ হইবেন, তাহা তিনি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। সন্তানের উপর কত আশা করিয়াই—তাহাদের উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সে উচ্চ শিক্ষার ফল কি এই?—সন্তান পিতাকে তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল হইতে—পিতাপুত্রের সম্বন্ধ হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইতে আদেশ করে,—অর্থের বিনিময়ে

পিতৃঋণ শোধ করিয়া নিজেদের শিক্ষিত জীবনকে ধন্য মনে করে—যে শিক্ষায় এই ধারণা হয়, তাহাই কি উচ্চশিক্ষা? ধন্য পাশ্চাত্য জ্ঞান গরিমা—আর শত ধন্যবাদ যাঁহারা আত্ম-মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া সন্তানদের সনাতন রীতিনীতি শিক্ষা দিবার পূর্ব্বেই ভয়াবহ এই পাশ্চাত্য জ্ঞান—এই ম্লেচ্ছাচার শিক্ষা দিতে অণুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না, তাঁহাদের।

হরনাথ ভাবিতেছিলেন, নিজের দোষেই সব হারাইয়াছি, সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠদের প্রতি কর্ত্তব্যের ত্রুটি ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া তাহাদের ভক্তি হইতে নিজেই বঞ্চিত হইয়াছি। তাহাদের কোন ত্রুটিই থাকে নাই। বংশের গৌরব রক্ষার জন্যই—স্বধর্ম্ম সাধন উদ্দেশ্যেই পরিণাম ভাবিয়াই তাহারা—আমার মতের পক্ষপাতী হয় নাই। তাহারা কর্ত্তব্যের অনুরোধেই জ্যেষ্ঠের স্নেহ হইতে নিজেদের পৃথক্ করিয়া লইয়াছিল। আমার স্বার্থসিদ্ধির পথ, আমার স্বেচ্ছাচারের পথ বাধাশূন্য করিবার নিমিত্তই ছলে-বলে-কৌশলে তাহাদিগকে এক সংসার হইতে ভিন্ন সংসার পাতিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া নিজের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করি। তখন ত বুঝিতে পারি নাই—লোকের শত উপদেশেও বুঝিতে পারি নাই, ধারণায় আনিতে পারি নাই যে, আমার স্বহস্তে রোপিত বিষবৃক্ষের আশু প্রাণঘাতী ফলে আমারই জীবনের শেষ হইবে। আমার বড়

অহঙ্কার ছিল, আমি বড় বেশী বড়াই করিতাম যে, মানুষ নিজের জীবনে কখনও যেন পরমুখাপেক্ষী না হয়, এমন ভাবেই যেন শিক্ষালাভ করে। স্বাধীনভাবে নিজের জীবনভার বহনে সক্ষম না হইলে—সন্তানদের সেইভাবে শিক্ষা না দিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি করা হয়। এই অন্ধ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই না আজ আমার এই দশা। তখন ত বুঝি নাই যে, আমার এই 'স্বাধীন ভাবের' অর্থ কেবলমাত্র নিজের ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করা। আর যাহাকে 'পরমুখাপেক্ষী জীবন' বলিয়া—অশিক্ষিত জীবন বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম,—তাহার অর্থ ত্যাগ,—ধর্ম্মের মাহাত্ম্য। ভোগে যে নিবৃত্তি নাই;—সে যে নিজের শক্তিতে নিজের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া জীবকে আপনার কর্ত্তব্যের পথ হইতে প্রতি নিয়ত ভ্রষ্ট করিয়া দেয়—মনুষ্যত্বের পরিবর্ত্তে পশুত্বে পরিণত করিয়া ভোগীর পরিণামকে—শেষ জীবনকে আত্ম-গ্লানির অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হয়। আর ত্যাগে যে পরমানন্দ আছে, সে যে নিজের শক্তিতে নিজের মাহাত্ম্যে আপামর সাধারণকে দীক্ষিত করিয়াও মনুষ্যত্বের পরিবর্ত্তে দেবত্ব দিয়া এ মর-জগৎ হইতে ত্যাগীর জীবনকে স্বর্গের পবিত্রতার মধ্যে নিজের হাতে সিংহাসন পাতিয়া দেয়। প্রথম জীবনে যদি এই দু'য়ের পার্থক্য—বিপরীত গতি বুঝিতে পারিতাম!

"মহামায়া, মা তোমাদের কষ্ট হচ্ছে,—অনেক রাত্রি হয়েছে, একটু শোওগে যাও। অমর তুমিও যাও বাবা, ভাই, বোনে একটু বিশ্রাম করগে; এত বেশী পরিশ্রম করলে তোমাদের শরীরও খারাপ হ'তে পারে।"

"জেঠামহাশয়, আপনার অসুখ করেছে, আমরা আপনার সেবা শুশ্রূষা করবো, তাতে কি আমাদের কোনও কষ্ট হয়। আপনাকে সুস্থির না দেখে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে কি করে ঘুমাবো? আপনার এমন অসুখের সময় দাদারা এখানে নাই; যাতে আপনার কোন কষ্ট না হয়—যা'তে তাঁদের অভাব আপনি না বুঝতে পারেন, আমরা সেই রকম করেই আপনার সেবা করবো, তাঁহাদের অভাব আপনাকে কোনও রকমে জানতে দেব না যে জ্যেঠামণি, সেজদাদা আর আমি, আপনার সেবার জন্য বড় দাদার আর মেজদাদার স্থান অধিকার করে বসেছি যে জ্যেঠামণি।"

"মা, মহামায়া সত্যি করে বল্ দেখি, তাদের স্থান তোরা ভাই-বোনে পূরণ করবি। খুব ঠিক্ ক'রে—মনে-প্রাণে ভেবে, বল্ দেখি,—আমার সম্পদে-বিপদে আমার সুখে-দুঃখে, তোরা দু'টিতে তাদের স্থান অধিকার করে, আমার আজীবনের ত্রুটির জন্য সমাজের নিকট—আর আমার এই কনিষ্ঠ দু'টি ভাইয়ের নিকট ক্ষমা চাহিবার অবসর দিবি বল্ মা মহামায়া, বল বাবা

অমরনাথ, তোরা আজ হ'তে আমার সেবার ভার নিয়ে পুত্রদের স্থানে অধিকার কর্ব্বি।"

"জেঠামহাশয়, মহামায়া ঠিক বলেছে, ভগবান্ যে আমাদের তাই করেই—আপনাদের সেবার অধিকার দিয়েই পাঠিয়েছেন, আমরা যে জন্মগতই আপনাদের সেবাদাস। সত্যি করে বল্লেও মনপ্রাণে ঠিক করে আজীবন বল্লেও যে সবকথা বলা যেতে পারে না, কেউ বল্‌তে পারে না জেঠা মহাশয়, যে 'আমি আমার পিতামাতার সেবা করে, পুত্রের উপযুক্ত কর্ত্তব্য রক্ষা করেছি।' পিতৃমাতৃঋণ পরিশোধ দেবশক্তিরও অসাধ্য—অদেয়। পিতা যে যত্নে যে স্নেহের আবরণের মধ্যে পুত্রদের পালন করেন, যে আগ্রহে ভগবানের নিকট তাহাদের মঙ্গল-কামনা করেন, তাদের বর্ত্তমান জীবনের সুখ শান্তিরক্ষার জন্য —তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির জন্য—ইহ-পরকালের মঙ্গলের জন্য, পিতা নিজের জীবন, নিজের ইহ-পরকাল অতি তুচ্ছ বোধে যে ভাবে প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে 'অজপার' পরিবর্ত্তে সন্তানের মঙ্গলকামনা করেন, পুত্র কি তা'র কণামাত্র পরিশোধ কর্‌তে পারে জ্যেঠামণি। অভিমানের বশবর্ত্তী হয়ে, সামান্য মাত্র সামাজিক নিয়মে বাধ্য হয়ে,—আপনার সেবার দিকে লক্ষ্য না করে—আপনার ন্যায্য প্রাপ্য মর্য্যাদার হানি করে আমরা যে অপরাধ করেছি—যে পাপ করেছি,—আপান ক্ষমা করে

আমাদের ভাই-বোনকে—আমাদের মাতা পিতাদিগকে—আমাদের সকলকে ক্ষমা করে সেই পাপ হতে—সেই গুরুতর অপরাধ হতে মুক্ত করুন, জেঠা মহাশয়! অহঙ্কারের মধ্যে পড়ে আমরা যে অন্যায় করেছিলাম জন্মগত সম্বন্ধের উপরও যে অন্যায় ব্যবহারে তার নাশ কর্ত্তে চেয়েছিলাম, তার জন্য আমাদের ক্ষমা করুন।"

"ভগবান্ তোমার অনন্ত মহিমা বুঝিতে পারি সে শক্তি আমার নাই। তোমার অনন্তলীলার বিচিত্র গতি কে বুঝিবে? দয়াময়! তোমার অনন্ত কৃপার পাত্র—তোমার অসীম অনুকম্পার পাত্র বুঝিয়াই বুঝি এত দয়া করিলে। আমার অভিমান—অহঙ্কার আমার আজীবনের ভুল ভাঙ্গিবে বলিয়াই বুঝি আমার উপর দিয়াই এই লোকশিক্ষা দিলে। যাহাদের মোহে পড়িয়া যাহাদের জন্য সব হারাইয়াছিলাম, ইহ-কাল নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তাই বুঝি দয়া করিয়া তাহাদের কাড়িয়া লইয়া আমার সব ফিরাইয়া দিলে। মা মহামায়া, বাবা অমর, তাই হোক্, তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হোক্—ভগবানের ইচ্ছাও পূর্ণ হোক্, তোমরাই তাদের স্থান অধিকার কর। আমিও ধন্য হই।"

উত্তেজনার সঙ্গে অতি করুণকণ্ঠে অতি দীনের প্রার্থনার মত হরনাথ এই কয়টি কথা বলিয়া আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া

উঠিলেন! হৃদয়ের বিষাদ রাশি অনেক কষ্টে—চাপিয়া রাখিয়াছিল। পুত্রগণের কথা এ পর্য্যন্ত অমর ও মহামায়ার ব্যবহারে—বাড়বাগ্নির মত জ্বালাময় পুত্রদিগের আসুরিক ব্যবহার তাঁহার স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিতেছিল।

তাঁহার ব্যাকুলতায় শিবনাথ শঙ্করনাথ মনে করিয়াছিলেন, অমল ও বিমল নিকটে না থাকার জন্য তাঁর মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে, তাই দুই ভাই পরামর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন—"দাদা, অমল ও বিমলকে আস্‌বার জন্য টেলিগ্রাম করি। তারা আসুক। আপনার অসুখের সংবাদ তাদের জানান না হলে, পরে হয়ত তারা শুনে দুঃখ কর্‌তে পারে।"

"না না, তাদের কোনও দুঃখ হবে না। তাদের, আমি যে ভাবে শিক্ষা দিয়েছি—তাতে তারা কি জ্ঞান লাভ করেছে তোমরা শুন্‌বে, দেখবে,—এই দেখ" বলিয়া হরনাথ পুত্রদের প্রেরিত পত্রখানি মাথার বালিসের নীচে হইতে বাহির করিয়া শিবনাথের দিকে ফেলিয়া দিলেন। পত্রখানি দুই ভ্রাতায় পড়িয়া হরনাথের মুখের দিকে চাহিতেই হরনাথ বলিলেন—"দেখ ত ভাই শঙ্করনাথ ঐ পত্রের উত্তর খানা ঠিক লেখা হ'য়েছে কি না! তুমি পড়ে একবার আমাদের সকলকে শোনাও ত।"

"চিরজীবেষু,—

"বাবা অমল ও বিমল, তোমাদের পত্রখানি যথাসময়ে

পাইয়াছি। নিজের হস্তে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া নিজেই তাহার ফল খাইয়া যদি মানুষ মরে, তবে তার সে মৃত্যুকে মানুষে আত্মহত্যা বলে। আমি ঠিক সেই অবস্থায় পড়িয়াছি! আমার ছেলেদের আমি যে শিক্ষা দিয়াছি, তাহারই ফল আমাকে তাহাদের জন্মগত সম্বন্ধও ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতেছে! তোমাদের শিক্ষার উপযুক্ত ফলই ফলিয়াছে! পিতা স্বতঃই পুত্রের মঙ্গলকামনা করেন, কিন্তু বিনিময়ের প্রত্যাশা করেন না; —কর্ত্তব্যের অনুরোধেই স্নেহ মমতার আবরণে পুত্রদের লালন-পালন করেন। পুত্রও কর্ত্তব্যজ্ঞানে—আত্মোন্নতির জন্যই পিতার সেবা করে,—বিনিময়ে নহে। আমার কর্ত্তব্য সাধনে অশেষ ত্রুটি ছিল বলিয়া আমি পুত্রদের পিতৃভক্তি হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়াছি। আজ আমার জীবনের ত্রুটি বুঝিয়াছি,—বোধ হয় তোমরাও বুঝিতে পারিয়াছ বলিয়াই আমাকে একথা লিখিতে সাহস করিয়াছ যে, 'আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি-অবনতির সহিত এজগতে আর কাহারও সহিত কোনও সম্বন্ধ আছে, একথা যেন কেহ না ভাবেন'। যে পুত্র পিতাকে এভাবে পত্র লিখিতে পারে, সে পুত্রের সহিত পিতার কোনও সম্বন্ধ নাই—থাকিতেও পারে না, একথা ধ্রুব সত্য। কিন্তু সম্বন্ধ অবিনাশী বলিয়াই তাহা অনায়ত্ত। ইচ্ছা শক্তির অসীম-ক্ষমতাও সেখানে [illegible]কারী হইতে পারে না বলিয়াই

—যে পিতা সে চিরদিনই—ইহপরকালেও পিতা! যে পুত্র সে চিরদিনই—ইহপরজন্মেও পুত্র। পিতা পুত্রের অশ্রদ্ধার দান—সম্বন্ধত্যাগের বিনিময়ে মূল্যগ্রহণ করিতে পারে না বলিয়াই তোমাদের দেয় পিতৃমর্য্যাদা বনাম পিতৃঋণ যাহা তোমাদেরই পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছ, সেই লক্ষটাকা তাহা বিষতুল্য পরিত্যজ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

"যে বিদ্যার প্রভাবে জন্মগত সম্বন্ধ ত্যাগ হয় (?) এরূপ শিক্ষা লাভ হইয়াছে, তাহা আমাদের সনাতনের অনুষ্ঠেয় বা শিক্ষণীয় নহে। "পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" ইহা বুঝিয়া কার্য্য করি নাই—ইহা বুঝিতে তোমাদের কোন দিন শিক্ষা দিই নাই বলিয়াই—আজ আমার পুত্র তোমরা অভিশপ্তের ন্যায় সনাতনের

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

এই মহামন্ত্রের মহাসাধনে চিরতরে বঞ্চিত হইলে। অভিশপ্ত বলিয়াই স্বেচ্ছায় পরকালের পথ—আত্মোন্নতির পথ রুদ্ধ করিলে,—স্বেচ্ছায় স্বর্গপথ চিরতরে রুদ্ধ করিলে।

"বড় আশা করিয়াই তোমাদের মানুষ হইবার পথে—সুখী হইবার পথে প্রতি নিয়ত অগ্রসর হইতে দিয়াছিলাম। আমার ধারণা ছিল যে সে আশা কেবল সুখ, কেবল পরমানন্দে

পরিণত হইবে। কিন্তু কোন্ পথ দিয়া কর্ম্মস্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে আমার এই জীর্ণ জীবন তরীখানি বাহিয়া চলিলে সেই অমূল্যধনের—পরমানন্দলাভের অধিকারী হইতে পারি তাহা এ পর্য্যন্ত ঠিক করিতে পারি নাই।—আজ আমার সে আশা তোমাদের হইতেই পূর্ণ হইয়াছে, পুত্রের ব্যবহারেই পিতাকে সেই অমূল্যধনের অধিকারী করিয়াছে। তাহারই অমৃতময় সুধাক্ষরণের ধ্বনি দিবারাত্র আমার কর্ণে ধ্বনিত হইয়া সর্ব্বদা মেঘমন্দ্রের স্বরে আমাকে বলিতেছে—'ভোগে সুখ নাই, ত্যাগেই সুখ;—ত্যাগেই পরমানন্দ'। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরাও একদিন ঈশ্বরের কৃপায় এই ত্যাগের পথে আসিয়া যেন পরমানন্দলাভের অধিকারী হইয়াও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পার 'পরধর্ম্মোভয়াবহঃ'।"

সমাপ্ত

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি-সংস্করণ"—"সাত-পেনি-সংস্করণ" প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালাদেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক—ভাল জিনিসের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে; সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা বাঙ্গালা দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কীর্ত্তিকুশল গ্রন্থকারবর্গ-রচিত সারবান্ সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তকগুলি এইরূপ সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'অভাগী' ও 'পল্লী-সমাজের' এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে চতুর্থ সংস্করণ এবং ধর্ম্মপাল, বড়বাড়ী, কাঞ্চনমালা, দূর্ব্বাদল ও অরক্ষণীয়ার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার কারণ।

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, শুনেন নাই, আশাও করেন নাই। সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি! বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট আনা সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি। মূল্যবান্ সংস্করণের মতই কাগজ, ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। মফঃস্বল-বাসীদের সুবিধার্থ, অপ্রকাশিত গুলির জন্য নাম রেজেষ্ট্রি করা হয়; যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে ভিঃ পিঃ ডাকে ।৵৹ মূল্যে প্রেরিত হইবে। প্রকাশিত গুলি একত্রে লইতে হয়, বা পৃথক পৃথক সুবিধামত পত্র লিখিয়াও লইতে পারেন। এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে—

অভাগী (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

ধর্ম্মপাল (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পল্লীসমাজ (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কাঞ্চনমালা (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বিবাহবিপ্লব (২য় সংস্করণ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল্।

চন্দ্রনাথ—(২য় সংস্করণ) শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দূর্ব্বাদল (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

বড় বাড়ী (২য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

অরক্ষণীয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ময়ূখ—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

সত্য ও মিথ্যা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রূপের বালাই—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

সোণার পদ্ম—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

লাইকা—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।

আলেয়া—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নকল পাঞ্জাবী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল।

দুখের ঘর—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

রাণির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।

ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

নব্য বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ।

নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী।

নীলমাণিক—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ।

হিসাব নিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্।

মায়ের প্রসাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ইংরেজী কাব্যকথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম, এ।

জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

শয়তানের দান—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মণ-পরিবার—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

পথে-বিপথে (যন্ত্রস্থ)—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, আই, ই।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্—

২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা